আমার বাংলা বই

চতুর্থ শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

আমার বাংলা বই

চতুর্থ শ্রেণি
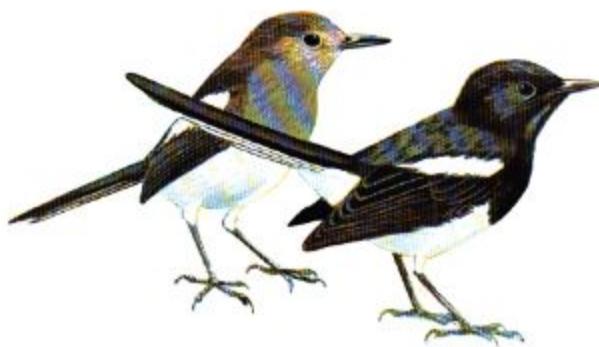
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
চতুর্থ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

আমার বাংলা বই

চতুর্থ শ্রেণি

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত
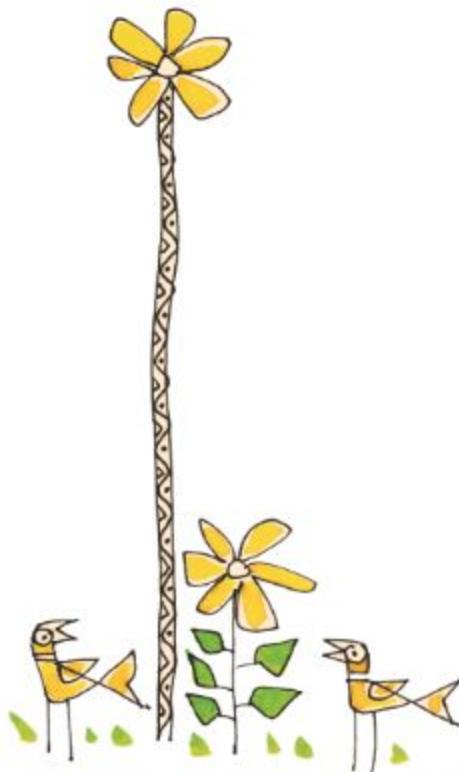
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

প্রথম সংস্করণ সংকলন ও রচনা

হায়াৎ মামুদ

মহাম্মদ দানীউল হক

মাসুদুজ্জমান

শিল্প সম্পাদনা

হাশেম খান

পরিমার্জিত সংস্করণের চিত্র

জয়ন্ত সরকার জন

প্রথম মুদ্রণ : আগস্ট ২০১২

পরিমার্জিত সংস্করণ : আগস্ট ২০১৫

পুর্নমুদ্রণ : আগস্ট ২০২৩

পরিমার্জিত সংস্করণ : অক্টোবর ২০২৪

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গকথা

প্রাথমিক স্তর শিক্ষার ভিত্তিভূমি। প্রাথমিক শিক্ষা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমুখী ও পরিকল্পিত না হলে গোটা শিক্ষাব্যবস্থাই দুর্বল হয়ে পড়ে। এই বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে ২০১০ সালের শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক স্তরকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিশ্বের উন্নত দেশসমূহের সাথে সংগতি রেখে প্রাথমিক স্তরের পরিসর বৃদ্ধি এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্তর এবং ধর্ম-বর্ণ কিংবা লৈঙ্গিক পরিচয় কোনো শিশুর শিক্ষা গ্রহণের পথে যেন বাধা হয়ে না দাঁড়ায়, এ বিষয়েও বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) একটি সমন্বিত শিক্ষাক্রম গ্রহণ করেছে। এই শিক্ষাক্রমে একদিকে শিক্ষাবিজ্ঞান ও উন্নতবিশ্বের শিক্ষাক্রম অনুসরণ করা হয়েছে, অন্যদিকে বাংলাদেশের চিরায়ত শিখন-শেখানো মূল্যবোধকেও গ্রহণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষাকে অধিকতর জীবনমুখী ও ফলপ্রসূ করার প্রয়াস বাস্তব ভিত্তি পেয়েছে। বিশ্বায়নের বাস্তবতায় শিশুদের মনোজাগতিক অবস্থাকেও শিক্ষাক্রমে বিশেষভাবে বিবেচনায় রাখা হয়েছে।

শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান-উপকরণ হলো পাঠ্যপুস্তক। এই কথাটি মাথায় রেখে এনসিটিবি প্রাথমিক স্তরসহ প্রতিটি স্তর ও শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে সবসময় সচেষ্ট রয়েছে। প্রতিটি পুস্তক রচনা ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। শিশুমনের বিচিত্র কৌতূহল এবং ধারণক্ষমতা সম্পর্কে রাখা হয়েছে সজাগ দৃষ্টি। শিখন-শেখানো কার্যক্রম যেন একমুখী ও ক্লান্তিকর না হয়ে আনন্দের অনুষঙ্গ হয়ে ওঠে সেদিকটি শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আশা করা যায়, প্রতিটি বই শিশুদের সুষম মনোদৈহিক বিকাশে সহায়ক হবে। একই সাথে তাদের কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা, অভিযোজন সক্ষমতা, দেশপ্রেম ও নৈতিক মূল্যবোধ অর্জনের পথকেও সুগম করবে।

চতুর্থ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নের সময়ে পূর্ব-শ্রেণির ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হয়েছে। প্রথম শ্রেণির বাংলা পাঠ্যপুস্তকে ভাষাশিক্ষার প্রাথমিক পর্যায়ের অনুশীলন রয়েছে। দ্বিতীয় শ্রেণির বাংলা পাঠ্যপুস্তকে প্রথম কয়েকটি পাঠে প্রথম শ্রেণিতে শেখা ভাষার ভিত্তিমূলক মৌলিক জ্ঞানের পুনর্পাঠ রাখা হয়েছে। তৃতীয় শ্রেণির বর্তমান পাঠ্যপুস্তকে দ্বিতীয় শ্রেণির কিছু পাঠ পুনরায় রাখা হয়েছে। একইভাবে চতুর্থ শ্রেণির বর্তমান পাঠ্যপুস্তকে তৃতীয় শ্রেণির কিছু পাঠ পুনরায় রাখা হয়েছে। চারটি পাঠ্যপুস্তকেই তথ্য ও বর্ণনামূলক রচনাগুলোর ধারাবাহিকতা রয়েছে। আশা করা যায়, চতুর্থ শ্রেণির বাংলা পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ভাষাশিক্ষার ভিত মজবুত হবে এবং তা পরবর্তী শ্রেণির জন্য সহায়ক হবে।

বইটি রচনা, সম্পাদনা ও পরিমার্জনে যেসব বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষক নিবিড়ভাবে কাজ করেছেন তাঁদের বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই। কৃতজ্ঞতা জানাই তাঁদের প্রতিও যাঁরা অলংকরণের মাধ্যমে বইটিকে শিশুদের জন্যে চিত্তাকর্ষক করে তুলেছেন। ২০২৪ সালের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রয়োজনের নিরিখে পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিমার্জন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ২০১২ সালের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রণীত পাঠ্যপুস্তকটিকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। সময় স্বল্পতার কারণে কিছু ভুলত্রুটি থেকে যেতে পারে। সুধিজনের কাছ থেকে যৌক্তিক পরামর্শ ও নির্দেশনা পেলে সেগুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নেওয়া হবে।

পরিশেষে বইটি যাদের জন্য সেই কোমলমতি শিক্ষার্থীদের সার্বিক কল্যাণ কামনা করছি।

অক্টোবর ২০২৪

প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

শিক্ষক নির্দেশনা

চতুর্থ শ্রেণির বাংলা পাঠ্যপুস্তকে ভাষা-শিখনে সহায়ক বিভিন্ন ধরনের পাঠ সন্নিবেশ করা হয়েছে। এই পাঠ্যপুস্তকে বর্ণনামূলক, তথ্যমূলক, কল্পনা-নির্ভর ইত্যাদি বৈচিত্র্যময় পাঠ ব্যবহার করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট ভাষা-পরিমণ্ডল বিবেচনা করে পাঠ নির্বাচন ও উন্নয়ন করা হয়েছে। ভাষা-শিখন প্রক্রিয়াকে শিক্ষার্থীদের জীবন ঘনিষ্ঠ করার জন্য ভাষাসমগ্র পদ্ধতিকে (Whole Language Approach) ভাষা শিখনের ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ শ্রেণির এ পর্যায়ে ভাষা-শিখনের বিশেষ করে পড়ার দক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের সহায়তা প্রয়োজন হয়। এ পাঠ্যপুস্তকে ভাষা দক্ষতা হিসেবে শোনা, বলা, পড়া ও লেখার দক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের জন্য সহায়ক শিখন-অনুশীলনী দেওয়া হয়েছে। শোনা, বলা, পড়া ও লেখার দক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করার জন্য শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে নিম্নলিখিত শিখন-শেখানো কৌশল ব্যবহার করবেন।

শোনা ও বলা

শ্রেণিকক্ষে শোনা ও বলা সংশ্লিষ্ট শিখন-শেখানো কর্মকাণ্ডে শিক্ষার্থীদের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করাতে শিক্ষক নিম্নলিখিত কাজগুলো করবেন।

- শ্রেণিকক্ষে সকল শিক্ষার্থী শুনতে পারে এমন শ্রুতিগ্রাহ্য স্বরে, স্পষ্টভাবে ও প্রমিত উচ্চারণে কথা বলবেন;
- শিক্ষার্থীদের সক্রিয়ভাবে শুনতে বলবেন;
- শিক্ষার্থীদের এমন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন যাতে চিন্তার উদ্রেক করে;
- চিন্তা করতে ও পর্যাপ্ত কথা বলতে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করবেন;
- আলোচনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করাবেন;
- শিক্ষার্থীদের নিজের অভিমত ও মতামত প্রকাশের সুযোগ দেবেন;
- শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করবেন।

পড়া

চতুর্থ শ্রেণি শেষে প্রত্যাশিত পর্যায়ে পড়ার দক্ষতা অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীদের যেসব দক্ষতা অর্জন করা প্রয়োজন তা হলো :

- শুদ্ধ, স্পষ্ট ও প্রমিত উচ্চারণে পড়া;
- সঠিক উচ্চারণে শব্দ পড়া;
- শব্দের বানান, অর্থ ও বাক্য পড়া;
- সঠিক গতিতে বিরামচিহ্ন মেনে বাক্য পড়া ও অর্থোদ্ধার করা;
- অনুচ্ছেদ পড়ে অর্থোদ্ধার করা;
- পড়া সংশ্লিষ্ট শিখন অনুশীলনী সম্পন্ন করা;
- যুক্তব্যঞ্জন স্পষ্ট ও শুদ্ধ উচ্চারণে পড়া।

লেখা

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিজের ভাষায় লিখতে উৎসাহিত করবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দিয়ে লেখার কাজ এককভাবে করাতে পারেন। শিক্ষক জুটিতে এমনকি দলেও শিক্ষার্থীদের লেখার কাজ করাতে পারেন। শিক্ষার্থীরা আলোচনা করবে এবং নিজের মতামত নিজের ভাষায় লিখবে। এতে তাদের লেখার দক্ষতা ও উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে। শিক্ষার্থীরা সহজ বাক্যে নিজেদের পছন্দমতো শব্দ দিয়ে লেখার কাজ শুরু করতে পারে।

শিখন পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীর অবস্থা ও শিখন-শেখানো কৌশলের কার্যকারিতা নিরূপণের জন্য নিয়মিত শিখন মূল্যায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া সম্পর্কে নির্দেশনা

ভাষা শিখন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য শ্রেণিকক্ষে নিচের নির্দেশনা ব্যবহার করা যেতে পারে। শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালনার জন্য পাঠ্যপুস্তককে ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। প্রতিটি পাঠের শেষে ভাষা-শিখনের জন্য সহায়ক কর্মকাণ্ড রয়েছে। পড়ার জন্য নির্ধারিত পাঠ ও পাঠ শেষে শিখন-সহায়ক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে একটি সম্পূর্ণ শিখন কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

প্রতিটি পাঠ পরিচালনার তিনটি পর্যায় থাকবে। পর্যায় তিনটি হচ্ছে :

পর্যায় ১: নির্ধারিত পাঠের অর্থ উদ্ধারের পর্যায়

এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীর নিজের আগ্রহ, বর্তমান জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে শিক্ষক ভাষা শিখন-শেখানোর জন্য ব্যবহার করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করবেন। এটি মূলত পাঠ ও পাঠসংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ড পরিচালনার প্রাথমিক পর্যায়। এ পর্যায়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে নির্ধারিত পাঠের অর্থ বুঝতে সহায়তা করবেন।

পর্যায় ২: ভাষা-শিখন সহায়ক কার্যক্রম পরিচালনা

এটি মূলত শিক্ষার্থীদের ভাষা-দক্ষতা শিখনের জন্য নির্ধারিত পাঠ ও পাঠসংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের পর্যায়। এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা ভাষাদক্ষতা হিসেবে শোনা, বলা, পড়া ও লেখা-সংশ্লিষ্ট শিখন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হবে। শিক্ষক এ পর্যায়ে ভাষা-শিখন সহায়ক কর্মকাণ্ডে শিক্ষার্থীদের সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করাবেন।

পর্যায় ৩: অর্জিত শিখন বাস্তবে প্রয়োগের সক্ষমতা উন্নয়নের পর্যায়

এ পর্যায়ে নির্ধারিত পাঠ থেকে অর্জিত শিখন শিক্ষার্থীরা বাস্তবে প্রয়োগ করবে। এ পর্যায়ে শিক্ষক জীবন-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্জিত শিখন ব্যবহারে শিক্ষার্থীর দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ প্রদান করবেন। অর্জিত শিখন যাতে শিক্ষার্থী বাস্তব জীবনে কাজে লাগাতে পারে তা এই পর্যায়ের শিখন-শেখানোর কর্মকাণ্ডের মূল লক্ষ্য। শ্রেণিকক্ষে পাঠ পরিচালনার তিনটি পর্যায় বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষক নিম্নলিখিত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারেন:

১. নির্ধারিত পাঠের অর্থ উদ্ধারের পর্যায়

এ পর্যায়ে পাঠ পরিচালনার জন্য শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে নিম্নোক্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারেন।

- প্রাসঙ্গিক আলোচনার মাধ্যমে পাঠ শুরু করা;
- পাঠ-সংশ্লিষ্ট ছবি বিশ্লেষণ করা;
- সম্ভাব্য বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা আলোচনা করা;
- পাঠের শিরোনাম পড়তে বলা;
- পাঠের বিষয়বস্তুর সঙ্গে পাঠের শিরোনামের প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মতামত জানতে চাওয়া;
- শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে শুদ্ধ, স্পষ্ট ও প্রমিত উচ্চারণে নির্ধারিত পাঠ পড়া;
- শিক্ষার্থীদের পড়তে দেওয়া ও পঠিত অংশের অর্থ অনুধাবন করার সুযোগ প্রদান;
- পাঠের নির্ধারিত অংশের মূল শব্দ চিহ্নিত করতে বলা ও সংশ্লিষ্ট বাক্য সরবে পড়তে বলা;
- প্রশ্ন করতে ও মতামত প্রদানে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা।

২. ভাষা শিখন সহায়ক কর্মকাণ্ড পরিচালনা পর্যায়

এই পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষক ভাষা শিখন সহায়ক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবেন। পাঠের শিখনফলের সাথে প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন শিখন-কর্মকাণ্ডের (learning activities) মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ভাষাদক্ষতা অর্জনে শিক্ষক সহায়তা করবেন। ভাষা-শিখন সহায়ক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড হচ্ছে :

- নতুন শব্দের অর্থ আলোচনা ও বাক্য পর্যায়ে তা প্রয়োগ;
- যুক্তবর্ণ বিশ্লেষণ ও যুক্তবর্ণ যোগে শব্দ গঠন;
- পাঠ প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন-উত্তর বলা ও লেখা;
- বিপরীত শব্দ জানা ও বাক্য পর্যায়ে তা প্রয়োগ;
- জোড় শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি;
- বিরামচিহ্ন হিসেবে দাঁড়ি, কমা ও প্রশ্নবোধক চিহ্ন সম্পর্কে জানা ও বাক্যে তা ব্যবহার;
- কথোপকথনভিত্তিক বাক্য বলা ও লেখা;
- ছবি দেখে বাক্য বলা ও লেখা;
- নির্ধারিত বিষয়বস্তু যেমন–নদী, ঋতু, প্রিয় প্রাণী ইত্যাদি সম্পর্কে একাধিক বাক্য লেখা;
- পাঠ্যপুস্তকের বাইরে সমমানের গল্প, কবিতা পড়া।

উল্লিখিত শিখন কর্মকাণ্ডে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করাবেন। প্রতিটি শিখন কর্মকাণ্ডে শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে পর্যাপ্ত চর্চার সুযোগ প্রদান করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে শিক্ষক নির্ধারিত পাঠের সাথে এ পর্যায়ে শিখন কর্মকাণ্ডসমূহ শ্রেণিকক্ষে যথাযথভাবে পরিচালনা করবেন। শব্দের অর্থ আলোচনার সময় শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা জানা, জীবনঘনিষ্ঠ উদাহরণের মাধ্যমে শিক্ষক অর্থ আলোচনা করবেন। যুক্তবর্ণ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শব্দে নির্ধারিত যুক্তবর্ণ দেখিয়ে তারপর শিক্ষক সংশ্লিষ্ট বর্ণ ভেঙে দেখাবেন। নির্ধারিত যুক্তবর্ণ যোগে একাধিক শব্দ উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করবেন। শিক্ষার্থীদের থেকে নির্ধারিত যুক্তবর্ণ যোগে শব্দ সম্পর্কে শিক্ষক জানতে চাইবেন। নতুন শব্দ ও যুক্তবর্ণ শিখন-শেখানোর জন্য শিক্ষক দেয়ালে অর্থসহ নতুন শব্দ এবং বিশ্লেষণসহ যুক্তবর্ণের তালিকা টানিয়ে রাখতে পারেন। নতুন শব্দ ও যুক্তবর্ণের দেয়াল-তালিকা শিক্ষার্থীদের শব্দ ও যুক্তবর্ণ শিখনকে সহজ ও কার্যকর করতে সহায়তা করবে। নতুন পাঠের সংশ্লিষ্ট নতুন শব্দ ও যুক্তবর্ণ শিক্ষক নিয়মিত তালিকায় যুক্ত করতে পারেন।

৩. অর্জিত শিখন বাস্তবে প্রয়োগের সক্ষমতা উন্নয়নের পর্যায়

এটি হচ্ছে শিক্ষার্থীর অর্জিত শিখন বাস্তবে প্রয়োগের পর্যায়। এ পর্যায়ে অর্জিত শিখনের ওপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থী নিজের ভাষায় লিখবে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী মুক্তভাবে নিজের ভাষায় প্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তু সম্পর্কে লিখবে। পাঠের উত্তর লেখার সাথে এ ধরনের লেখার পার্থক্য হলো, এ লেখা শিক্ষার্থীর অর্জিত শিখন ও অভিজ্ঞতা-নির্ভর। লেখায় নিজের জানা শব্দ ব্যবহারের জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীকে উৎসাহিত করবেন। শিক্ষার্থীকে পাঠে পড়ানো হয়নি এমন শব্দও যদি শিক্ষার্থী এ ধরনের লেখায় ব্যবহার করে তবে কোনো অসুবিধা নেই। লেখায় সৃজনশীলতার জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রশংসা করবেন। লেখায় বানান ভুল করলে সংশোধনের জন্য তিনি শিক্ষার্থীদের সুযোগ দেবেন। বানান শুদ্ধ হলে শিক্ষক শিক্ষার্থীর প্রশংসা করবেন।

শিক্ষার্থী যখন নিজের ভাষায় লেখা শেষ করবে শিক্ষক তখন তা সরবে পড়তে বলবেন। শিক্ষার্থীরা পরস্পরের সাথে লেখা বিনিময় করবে এবং একে অপরের লেখা সরবে পড়বে।

ভাষা-শিখনের প্রতিটি পর্যায়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিখন-উদ্দেশ্য গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবেন। প্রত্যেক শিক্ষার্থী যাতে প্রত্যাশিত যোগ্যতা অর্জন করতে পারে, সে জন্য শিখন-কর্মকাণ্ডে শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে অংশগ্রহণ করাবেন। ভাষাদক্ষতা শিখনের ক্ষেত্রে শোনা, বলা, পড়া ও লেখা পারস্পরিকভাবে সম্পর্কযুক্ত। কাজেই সামগ্রিক ভাষাদক্ষতা অর্জনে সহায়তা করতে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রতিটি দক্ষতা অর্জনের ওপর গুরুত্বারোপ করবেন। ভাষা শিখন-শেখানো কর্মকাণ্ডগুলি যাতে যৌক্তিক হয়, শিক্ষককে সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে। শ্রেণিকক্ষের প্রতিটি কর্মকাণ্ড শিক্ষার্থীদের ভাষা-শিখনে যাতে সহায়ক হয়, শিক্ষক সে ব্যাপারে যত্নবান হবেন। শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থীর মাঝে সংগঠিত সক্রিয় অংশগ্রহণমূলক কর্মকাণ্ড ভাষা-শিখনকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। কাজেই ভাষা শিখন-শেখানোর সকল ক্ষেত্রে শিক্ষক মিথস্ক্রিয়ামূলক (interactive) কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবেন যেখানে শিক্ষক-শিক্ষার্থী, শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থীর সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার অবাধ সুযোগ থাকবে।

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর পারস্পরিক একটি সক্রিয় শিখন পরিবেশ এবং শিক্ষার্থীর জীবন ঘনিষ্ঠ প্রেক্ষাপটের মধ্য দিয়ে ভাষা-শিখন শিক্ষার্থীদের বাস্তবমুখী ও কার্যকর ভাষাদক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে।

সূচিপত্র

বাংলাদেশের প্রকৃতি

ষড়ঋতুর দেশ বাংলাদেশ। প্রতি দুমাসে হয় একটি ঋতু। যেমন বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাস দুটি হলো গ্রীষ্মকাল। এরপর আষাঢ়-শ্রাবণ মিলে বর্ষাকাল। এভাবে ভাদ্র-আশ্বিন হচ্ছে শরৎকাল। তার পরে কার্তিক ও অগ্রহায়ণ মাস দুটি নিয়ে হেমন্তকাল। পৌষ আর মাঘ মাস হলো শীতকাল। ফাল্গুন ও চৈত্র এ দু মাস বসন্তকাল।

এরকমভাবে ছয়টি ঋতুই প্রত্যেক বছর আসা-যাওয়া করে। পৃথিবীর সব দেশে কিন্তু দু মাসে একটি ঋতু হয় না। অনেক দেশে দুটি থেকে তিনটি ঋতু দেখা যায়। খুব বেশি হলে চারটি ঋতু। আমাদের প্রতিটি ঋতুতে প্রকৃতি নতুন নতুন রূপে সাজে। একেক সাজে তাকে নতুন মনে হয়, তার চেনা চেহারা বদলে যায়।

প্রথমে গ্রীষ্মের কথাই ধরা যাক। গ্রীষ্মে কী প্রচণ্ড গরম! রৌদ্রের অসহ্য তাপ। দুপুরে যদি পথে বের হতেই হয়, তখন মাথার ওপরে ছাতা ধরে লোকে হাঁটে। গরম যতই হোক, গ্রীষ্মকে কিন্তু মধুমাস বলা হয় । এ সময় মধুর মতো মিষ্টি নানা ফল পাওয়া যায়। আম, জাম, কাঁঠাল, আনারস ও লিচু গ্রীষ্মকালের ফল।

২০১৮

গ্রীষ্মের পর আসে বর্ষা। বর্ষার আবার একেবারে অন্য চেহারা। আকাশ তখন কালো ঘন মেঘে ছেয়ে যায়।

বৃষ্টি পড়ছে তো পড়ছেই। কখনো বড়ো বড়ো ফোঁটায়, ধীরে ধীরে। কখনো হুড়মুড় করে। কখনো পড়ছে ঝিরঝির করে, খুব হালকা। এ ধরনের বৃষ্টির একটা নাম আছে। একে বলা হয় ইলশেগুঁড়ি। আর বড়ো বড়ো ফোঁটায় প্রচুর বৃষ্টির নাম মুষলধারে বৃষ্টি। কখনো আবার পড়ে ঝমঝম বৃষ্টি। নদীতে তখন ঢল নামে। বর্ষায় ফোটে কদম, কেয়া ও আরও নানা ফুল।

বর্ষার পর আসে শরৎ। শরৎ এলেই আবার সব পালটে যায়। শরৎকালে আকাশে সাদা মেঘ পেঁজা তুলোর মতো ভেসে বেড়ায়। আকাশ হয়ে ওঠে ঘন নীল। এ সময় ফোটে শিউলি ফুল। নদীর পাড় সাদা কাশফুলে ভরে যায়।
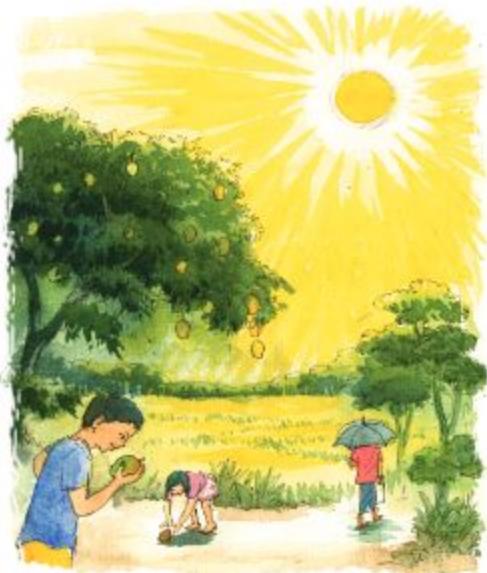
গ্রীষ্মকাল

বর্ষাকাল

শরতের পর পাকা ধানের শীষ নিয়ে আসে হেমন্ত। শুরু হয় ধান কাটা। এ সময় কৃষকের ঘর সোনালি ফসলে ভরে ওঠে। নবান্নের উৎসব ঘরে ঘরে আনন্দ নিয়ে আসে।

হেমন্তের শেষ দিকে শীতের আগমন টের পাওয়া যায়। তখন ভোরবেলায় একটু একটু শীত লাগে। এ সময় উত্তুরে হাওয়া বয়। উত্তর দিক থেকে আসা এ হাওয়া খুব ঠান্ডা। শীতের রাতে লেপ-কাঁথা গায়ে দিয়ে ঘুমোতে হয়। দিনের বেলায়ও গরম কাপড় পরতে হয়। শীতে খেজুরের রস দিয়ে তৈরি হয় নানা রকম পিঠাপুলি। গ্রামে পিঠা-পায়েস তৈরির ধুম পড়ে যায়।

২০২৫

শরৎকাল

হেমন্তকাল

শীতকাল

বসন্তকাল

যেই শেষ হলো এ ঋতু, অমনি শুরু হয় বসন্তকাল। এ সময় ফুরফুরে সুন্দর বাতাস বয়। বসন্তের দখিনা হাওয়ায় মন ভরে যায়। বসন্তে কোকিল ডাকে। কোকিলের ডাক বড়ই মিষ্টি। গাছে গাছে জেগে ওঠে নতুন সবুজ পাতা। নানা রঙের ফুলে ভরে যায় গাছ।

বাংলাদেশে ছয়টি ঋতু এভাবে আসে-যায়। ষড়ঋতুর এত বিচিত্র, সুন্দর রূপ পৃথিবীর আর কোথাও নেই।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি, অর্থ বলি এবং শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করি।

ইলশেগুঁড়ি মুষলধারে পেঁজা তুলো ষড়ঋতু বর্ষাকাল অসহ্য গ্রীষ্ম বিচিত্র নবান্ন

২. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. বাংলাদেশে বছরে কয়টি ঋতু আসে-যায়?

খ. বছরের বারো মাসের নাম বলি এবং লিখি।

গ. কোন কোন মাস নিয়ে কোন কোন ঋতু হয়? বলি এবং লিখি।

ঘ. বর্ষা ও শীত ঋতুর তুলনা করি।

ঙ. কোন ঋতু আমার বেশি পছন্দ? পছন্দের কারণ কী? লিখে জানাই।

৩. ডান দিক থেকে ঠিক শব্দ বেছে নিয়ে খালি জায়গায় লিখি।

ক. আমাদের দেশ .... দেশ ।

খ. গ্রীষ্মকে বলা হয় ....।

গ. বর্ষায় ফোটে .... নানা ফুল।

ঘ. হেমন্ত .... ঋতু।

ঙ. শীতকালে .... হাওয়া বয়।

সোনালি ধানের

উত্তুরে

ষড়ঋতুর

কদম, কেয়া ও আরও

মধুমাস

৪. ডান দিক থেকে শব্দ বেছে নিয়ে বাঁ দিকের শব্দের সঙ্গে মেলাই।

যাওয়া	ফুরফুরে বাতাস
খেজুরের	আসা
বসন্তকাল	প্রচণ্ড গরম
পিঠা	রস
গ্রীষ্ম	পুলি

৫. নিচের ছকের খালি ঘরে বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ঋতুর নাম লিখি।

বৈশিষ্ট্য	ঋতুর নাম
আকাশ তখন কালো ঘন মেঘে ছেয়ে যায়।	
নদীর পাড় সাদা কাশফুলে ভরে যায়।	
রৌদ্রের অসহ্য তাপ অনুভূত হয়।	
এই ঋতুতে খেজুরের রস দিয়ে তৈরি হয় নানা পিঠাপুলি।	
এ সময়ে কৃষকের ঘর সোনালি ফসলে ভরে ওঠে।	
গাছে গাছে জেগে ওঠে নতুন সবুজ পাতা।	

৬. নিচের বাক্যটি পড়ি এবং বিশেষ্য ও বিশেষণ পদ সম্পর্কে জেনে নিই।

কোকিলের ডাক মিষ্টি।

ব্যক্তি, বস্তু, সময় বা স্থানের নাম হলেই তা বিশেষ্য। উপরের বাক্যটিতে কোকিল হলো বিশেষ্য পদ। কিন্তু কোকিলের ডাক কেমন? মিষ্টি। এটি বিশেষণ পদ। যে শব্দ বিশেষ্য পদের কোনো গুণ বা চরিত্র প্রকাশ করে, সেটিই বিশেষণ। এখানে বিশেষণ পদ হচ্ছে মিষ্টি।

বিশেষ্য	বিশেষণ
কোকিল	মিষ্টি

এবার নিচের বাক্যগুলো পড়ি। বিশেষ্য পদগুলোকে গোল (○) চিহ্ন দিয়ে ও বিশেষণ পদগুলোর নিচে দাগ চিহ্ন (_) দিয়ে শনাক্ত করি।

ক. তখন হাড় কাঁপানো শীত।

খ. আকাশ হয়ে ওঠে ঘন নীল।

গ. ফুরফুরে সুন্দর বাতাস বয়।

ঘ. গ্রীষ্মে মিষ্টিফল পাওয়া যায়।

৭. কর্ম অনুশীলন

আমার দেখা চারপাশের প্রকৃতি সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লিখি।

পালকির গান

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

পালকি চলে!
পালকি চলে!
গগন তলে
আগুন জ্বলে!

স্তব্ধ গাঁয়ে
আদুল গায়ে
যাচ্ছে কারা
রৌদ্রে সারা!

ময়রা মুদি
চক্ষু মুদি,
পাটায় বসে
ঢুলছে কষে!
দুধের চাঁছি
শুষছে মাছি,—
উড়ছে কতক
ভনভনিয়ে।—
আসছে কারা
হনহনিয়ে?

হাটের শেষে
রুক্ষ বেশে
ঠিক দুপুরে
ধায় হাটুরে!

কুকুরগুলো
শুঁকছে ধুলো,—
ধুঁকছে কেহ
ক্লান্ত দেহ।

গঙ্গা ফড়িং
লাফিয়ে চলে;
বাঁধের দিকে
সূর্য ঢলে।

পালকি চলে রে!
অঙ্গ ঢলে রে!
আর দেরি কত?
আরও কত দূর?

(অংশবিশেষ)

অনুশীলনী

১. জেনে নিই।

পালকির বেহারারা পালকি কাঁধে নিয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যান। চলার পথে পা মেলাতে তারা তালে তালে গান গাইছেন। এই গানের কথায় গ্রামবাংলার চলমান জীবনের ছবি ফুটে উঠেছে।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

গগন আদুল পাটা ভনভনিয়ে কষে হাটুরে ধুঁকছে অজ্ঞা স্তব্ধ ধায় শুষছে

৩. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

পাটার	ময়রা	আদুল	হাটুরেরা	গগনে	দুধের চাঁছি	পালকি

ক. সকালে পূর্ব .... সূর্য ওঠে।

খ. শিশুরা বাড়ির উঠানে .... গায়ে খেলা করছে।

গ. .... উপর বসে দোকানদার জিনিস বিক্রি করছেন।

ঘ. .... মনের আনন্দে মিষ্টি বানাচ্ছেন।

ঙ. হাটের শেষে .... বাড়ি ফিরছেন।

চ. খোকা .... খেতে ভালোবাসে।

ছ. .... চড়ে বউ নাইওরে যান।

৪. যুক্তবর্ণগুলো দেখি। যুক্তবর্ণ দিয়ে গঠিত শব্দগুলো পড়ি ও লিখি।

স্তব্ধ	স্ত	স	ত		ব্যস্ত, সস্তা
	ব্ধ	ব	ধ		লব্ধ, ক্ষুব্ধ
রৌদ্র	দ্র	দ	্র	(র-ফলা)	নিদ্রা, ভদ্র
ক্লান্ত	ক্ল	ক	ল		ক্লাস, ক্লেশ
	ন্ত	ন	ত		শান্ত, পান্তা

৫. নিচের শব্দগুলো দেখি। এ ধরনের আরও কয়েকটি শব্দ লিখি।

ক. শনশন
খ. হনহন
গ. পিলপিল
ঘ. ....
ঙ. ....
চ. ....

৬. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. দুপুরের রোদে পালকির বেহারাদের কী অবস্থা হয়েছে?
খ. পাটায় বসে ময়রা কী করছেন?
গ. হাটুরে কোথায় যাচ্ছেন?
ঘ. কুকুরগুলো ধুঁকছে কেন?

৭. বই দেখে ছন্দের তালে তালে কবিতাটি বারবার পড়ি।

৮. কবিতাটি না দেখে আবৃত্তি করি।

৯. কর্ম-অনুশীলন।

'পালকির গান' কবিতার অনুকরণে আমি একটি ছড়া বা কবিতা লেখার চেষ্টা করি।

কবি-পরিচিতি

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

কলকাতার কাছে নিমতা গ্রামে ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারি কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর কবিতায় ছন্দের দোলা ও শব্দের ঝংকার খুব ভালো লাগে। তাঁকে 'ছন্দের যাদুকর' বলা হয়। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থগুলোর মধ্যে 'কুহু ও কেকা', 'অভ্র-আবীর', 'হসন্তিকা' উল্লেখযোগ্য। 'পালকির গান' কবিতাটি 'কুহু ও কেকা' কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দের ২৫শে জুন কবি মৃত্যুবরণ করেন।

বড়ো রাজা ছোটো রাজা

দুই রাজা, বড়ো রাজা আর ছোটো রাজা। দুজনে একদিন দিগ্‌বিজয় করতে চললেন। বড়ো রাজা চললেন বড়ো বড়ো হাতি-ঘোড়া, কামান-বন্দুক সাজিয়ে। মস্ত জয়ঢাক পিটিয়ে বড়ো বড়ো সেনাপতির সঙ্গে, বড়ো বড়ো রাজ্য জয় করতে করতে।

এদিকে ছোটো রাজা চললেন সাধারণ মানুষের সাজে। ছোটো ছোটো কামান-বন্দুক, হাতি-ঘোড়া নিয়ে ছোটো একটি পুঁটলি বেঁধে। ছোটো রাজ্য জয় করতে।

মস্ত বড়ো এই পৃথিবী – বড়ো রাজা ক্রমে ক্রমে তা জয় করে ফেললেন। এমন সময় চর এলো, খবর দিল– মহারাজ, শুনে এলাম, ছোটো রাজা ছোটো রাজ্য নিয়ে সুখে রয়েছেন। বড়ো রাজা বললেন, "তাকে গিয়ে বলো, আমি এই পৃথিবীটা জয় করে নিয়েছি। সে রাজ্য ছেড়ে অন্যত্র যাক।"

দূত গেল ছোটো রাজার কাছে। কিন্তু ছোটো রাজার সে রাজ্য এত ছোটো যে দূত দেখতেই পেল না। কোথায় রাজা! কোথায় রাজত্ব! সে ফিরে এসে বড়ো রাজাকে খবর দিল– চক্ষুর অগোচর সে রাজত্ব। সেখানে প্রবেশ করা ভারি কঠিন।

বড়ো রাজা বড়োই খাপ্পা হয়ে বললেন, "চলো আমি নিজে যাব।"

বড়ো রাজা মস্ত মস্ত হাতি-ঘোড়া, রথ-রথী নিয়ে চললেন পৃথিবী কাঁপিয়ে। কিন্তু ছোটো রাজ্য এতটাই ছোটো যে, সেখানে হাতি ঘোড়া কিছুই চলে না। মন্ত্রীরা মন্ত্রণা দিল –"সবার চোখে অণুবীক্ষণ লাগিয়ে যুদ্ধে চলো।"

সেনাপতি বললেন, "এতে করে চোখ চলবে, গোলাগুলি চলার উপায় হবে না।"
রাজা বললেন, "দেখাই যাক না।"

যুদ্ধ বাঁধল— সেনাপতির পায়ের তলা দিয়ে গলে ছোটো রাজার ফৌজ পালাল। তীর-কামান শত্রু আন্দাজ করতে না পেরে বাতাসে হানা দিতে থাকল। আকাশ থেকে সেগুলো ঝুপঝাপ বড়ো রাজার ছাউনির উপর পড়তে লাগল। বড়ো বড়ো অস্ত্র–সেসব অস্ত্র বড়ো জিনিসকেই লক্ষ করে। ছোটোকে দেখতে পায় না। বড়ো রাজা, বড়ো বড়ো মন্ত্রী, বড়ো বড়ো সেনাপতি ফাঁপরে পড়ে গেলেন। ছোটো রাজার সঙ্গে সন্ধি করতে চাইলেন। ছোটো রাজা হেসে বললেন, "আপনি আপনার মস্ত রাজত্ব নিয়ে সুখে থাকুন। ছোটোতে-বড়োতে সন্ধি হলে কী হয় তা জানেন না কি?"

বড়ো রাজা বললেন, "তা কি আর জানিনে?"

সেনাপতি বললেন, "এত বড়ো পৃথিবীটা জয় করে এলেন বড়ো রাজা। ওইটুকু আর জানেন না?"

ছোটো রাজা বললেন, "তাহলে এবারকার মতো এতটুকু জেনেই ঘরে চলে যান সকলে। আরও কী জানতে চান?"

বড়ো রাজা রেগে বললেন, “ছোটোকে টুঁটি চেপে ধরলে কী করে তাই জানাতে চাই।” বলেই বড়ো রাজা নিজের মস্ত মুঠোয় রাজ্যসহ ছোটো রাজাকে কষে চেপে ধরলেন। বড়ো রাজার মোটা মোটা আঙুলের ফাঁক দিয়ে জলের মতোই সব গলে পালাল। ছোটো রাজা, তার রাজসিংহাসন রাজপুরী সমস্তই বেরিয়ে গেল। বড়ো রাজা হাত খুলে দেখলেন মুঠো খালি। বুড়ো আঙুলের গোড়ায় মৌমাছির হুলের মতো একটা কী বিঁধে রয়েছে। যন্ত্রণায় বড়ো রাজার আঙুলটা দেখতে দেখতে ফুলে ঢোল হয়ে উঠল।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

দিগ্‌বিজয় সেনাপতি রাজত্ব জয়ঢাক চর দূত অগোচর খাপ্পা মন্ত্রণা
অনুবীক্ষণ ফৌজ অস্ত্র সন্ধি রথ-রথী ঝুপঝাপ রাজ্য মুঠো

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

ফাঁপরে	অন্যত্র	আন্দাজ	জয়ঢাক	দিগ্‌বিজয়	রাজসিংহাসনে

ক. সমস্ত ছোটো রাজ্য জয় করে রাজা .... বসলেন।

খ. রাজার খামখেয়ালিতে মন্ত্রী .... পড়লেন।

গ. রাজা .... করে এসেছেন।

ঘ. শিকারের খোঁজে রাজা............................ যাচ্ছেন।

ঙ. রাজ্য জয়ের আনন্দে চারিদিকে............................. বাজছে।

চ. রাজা............................ করলেন, ছোটো রাজা পালিয়ে যেতে পারেন।

৩. যুক্তবর্ণগুলো দেখি ও যুক্তবর্ণ দিয়ে গঠিত শব্দগুলো পড়ি ও লিখি।

শব্দ	যুক্তবর্ণ				উদাহরণ
মস্ত	স্ত	স	ত		আস্ত, গোস্ত
বন্দুক	ন্দ	ন	দ		নিন্দুক, বিন্দু
রাজ্য	জ্য	জ	্য	(য-ফলা)	ত্যাজ্য, ভাজ্য
ক্রমে	ক্র	ক	্র	(র-ফলা)	চক্র, বক্র
খাপ্পা	প্প	প	প		ধাপ্পা, বেখাপ্পা

৪. বাক্য রচনা করি।

রাজ্য চর রথ মুঠো রাজসিংহাসন

২০২৫

৫. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের ঠিক বাক্যাংশ মিলিয়ে পড়ি ও লিখি।

বড়ো রাজা আর ছোটো রাজা	সেখানে হাতি চলে না, ঘোড়া চলে না।
ক্রমে ক্রমে মস্ত বড়ো এই পৃথিবী	ঢোল হয়ে উঠল।
ছোটো শহর এতটাই ছোটো যে	বড়ো জিনিসকেই লক্ষ করে।
বড়ো রাজার আঙুল ফুলে	বড়ো রাজা জয় করে ফেললেন।
বড়ো বড়ো অস্ত্র	দিগ্‌বিজয় করতে চললেন।

৬. একই শব্দের ভিন্ন অর্থ শিখি ও বাক্য তৈরি করি।

চর – দূত
চর – নদীর চর
চলা – পায়ে হাঁটা
চলা – চালিত হওয়া

৭. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. বড়ো রাজা কীভাবে রাজ্য জয় করতে বের হলেন?
খ. বড়ো রাজা ছোটো রাজার উপর রেগে গেলেন কেন?
গ. বড়ো রাজা কেন ছোটো রাজ্যকে জয় করতে পারলেন না?
ঘ. বড়ো রাজা কেন সন্ধি করতে চাইলেন?
ঙ. বড়ো রাজা আর ছোটো রাজার মধ্যে তোমার কাকে বেশি পছন্দ? কেন?

৮. অল্প কথায় গল্পটা বলি।

৯. কর্ম-অনুশীলন।

ক. শক্তির চেয়ে বুদ্ধির জোর বেশি–বিষয়টি নিয়ে শিক্ষকের সহায়তায় বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করি।
খ. বড়ো রাজা এবং ছোটো রাজার ভূমিকায় অভিনয় করে দেখাই।

টুনুর কথা

বাবা-মা তাকে আদর করে টুনু নামে ডাকতেন। তার বাড়ি ছিল কিশোরগঞ্জ জেলার কেন্দুয়া গ্রামে। নয় ভাইবোনের মধ্যে সে ছিল সবার বড়ো।

ছেলেটির বাড়ির পাশ দিয়ে ব্রহ্মপুত্র নদী বয়ে গেছে। সে সারাদিন নদী দেখত, নদী তীরের কাশবন দেখত, নদীর উপর উড়ে যাওয়া পাখি দেখত, গুনটানা নৌকা দেখত; আর দেখত

পথঘাট, গাছপালা, আকাশ ও ফসলের মাঠ। ছেলেটা এসব দেখত আর ছবি আঁকত। ছবি আঁকতে তার খুব ভালো লাগত। পাখির ছবি, নদীর ছবি, নৌকার ছবি, জেলেদের মাছ ধরার ছবিসহ আরও কত ছবি! ছবি এঁকে এঁকে সে তার মাকে দেখাত। মা তার ছবি দেখে খুব খুশি হতেন। তার খুব ইচ্ছা ছবি আঁকার উপর পড়াশোনা করবে।

সে জানতে পারল, কলকাতা শহরে একটা সরকারি আর্ট স্কুল আছে। তখন তার বয়স ১৬ বছর, দশম শ্রেণির ছাত্র। সে একদিন বাড়ির কাউকে না বলে আর্ট স্কুল দেখতে কলকাতা চলে গেল। ফিরে এসে বাবা-মার কাছে বায়না ধরে বসল, সে কলকাতার আর্ট স্কুলে ভর্তি হবে। ছেলের আবদারে বাবা-মা চিন্তায় পড়ে গেলেন।

নয় ভাইবোনের মধ্যে ছেলেটি ছিল সবার বড়। তার বাবা পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর। সরকারি বেতনে এতবড় পরিবার চালাতে তাঁদের হিমশিম অবস্থা। তবু ছেলের আগ্রহ ও জেদকে উপেক্ষা করতে পারলেন না মা। তিনি তাঁর গহনা বিক্রি করে ছেলেকে কলকাতা আর্ট স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিলেন।

কলকাতায় অনেক কষ্টে তার দিন কাটতে লাগল। কিন্তু সে ছিল ক্লাসের সেরা ছাত্র। আর্ট স্কুলের সব শিক্ষক তাকে খুব পছন্দ করতেন। আর্ট স্কুলের পরীক্ষায় সে সবার চেয়ে ভালো করল। সেই ছেলেটিই পৃথিবী বিখ্যাত শিল্পী জয়নুল আবেদিন। তাঁকে আমরা শিল্পাচার্য নামে ডাকি।

পড়াশোনা শেষ করে তিনি কলকাতা আর্ট কলেজেই শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তাঁর ছবির খবর ছাপা হতে থাকে। একবার সারা ভারতের ছবির প্রদর্শনীতে তিনি সোনার মেডেল পুরস্কার পান।

তখন বাংলা ১৩৫০ সাল। সে বছর অনেক বড়ো দুর্ভিক্ষ হয়। জয়নুল আবেদিন তখন দুর্ভিক্ষের ছবি আঁকেন, অনেক অনেক ছবি। সেইসব ছবি দেখে দেশ-বিদেশের মানুষ এদেশের দুর্ভিক্ষের কথা জানতে পারে।

১৯৭০ সালে তিনি দুটি বিখ্যাত ছবি আঁকেন। একটির নাম 'নবান্ন' এবং আরেকটির নাম 'মনপুরা-৭০'। 'নবান্ন' ছবিতে তিনি এদেশের গ্রামবাংলার মানুষের জীবনযাত্রা ফুটিয়ে তোলেন। আর 'মনপুরা-৭০' ছিল ঘূর্ণিঝড়ের ছবি। ১৯৭০ সালে এদেশে অনেক বড়ো ঘূর্ণিঝড় হয়। 'মনপুরা-৭০' ছবিতে তিনি সেই ভয়ংকর ঝড়ের রূপ আঁকেন। এছাড়া 'বিদ্রোহী', 'মই টানা', 'গুন টানা', 'গাঁয়ের বধূ' ইত্যাদি তাঁর বিখ্যাত ছবির নাম।

তখন বাংলাদেশে আর্ট স্কুল ছিল না। তিনি ১৯৪৮ সালে ঢাকায় এসে একটা আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর ১৯৫৮ সালে সেই স্কুলটিকে ঢাকা আর্ট কলেজে রূপ দেন। সেই আর্ট কলেজটাই এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট।

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন ১৯১৪ সালের ২৯শে ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৭৬ সালের ২৮শে মে মৃত্যুবরণ করেন।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি এবং অর্থ বলি।

ঘূর্ণিঝড়, গুনটানা, দুর্ভিক্ষ, নবান্ন, বিদ্রোহী

২. শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করি।

ক. জয়নুলের বাড়ির পাশ দিয়ে .... নদী বয়ে গেছে।

খ. ১৯৭০ সালে তিনি দুটি বিখ্যাত ছবি .... ও .... আঁকেন।

গ. 'মনপুরা-৭০' ছিল .... ছবি।

ঘ. ১৯৪৮ সালে ঢাকায় তিনি .... প্রতিষ্ঠা করেন।

ঙ. শিল্পাচার্য মৃত্যুবরণ করেন .... সালে।

৩. জয়নুল আবেদিনের সংক্ষিপ্ত জীবনী রচনা করি।

নাম –

জন্মসাল ও জন্মস্থান –

শৈশব –

কলেজের নাম –

তাঁর আঁকা বিখ্যাত ছবি-

তাঁর গড়ে তোলা প্রতিষ্ঠান –

মৃত্যুর তারিখ –

৪. বাম অংশের সঙ্গে ডান পাশের তথ্যগুলো মিলিয়ে পড়ি।

বাবা-মা জয়নুলকে আদর করে	১৯৪৮ সালে
জয়নুল কাউকে না বলে কলকাতা যান	১৩৫০ সালে
দেশে বড় রকমের দুর্ভিক্ষ হয়	বিদ্রোহী, নবান্ন, মনপুরা-৭০
তাঁর বিখ্যাত ছবি	টুনু বলে ডাকতেন
ঢাকায় আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন	১৬ বছর বয়সে

৫. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. জয়নুল আবেদিনের জন্ম কোথায়?

খ. ১৩৫০ সালে জয়নুল কিসের ছবি আঁকেন?

গ. 'নবান্ন' ছবিতে কী ফুটে উঠেছে?

ঘ. কত সালে তিনি আর্ট স্কুলকে কলেজে রূপ দেন?

ঙ. জয়নুলের বিখ্যাত ছবিগুলো কী কী?

৬. বড়ো হয়ে কী হতে চাই, সে সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লিখি।

২০২৫
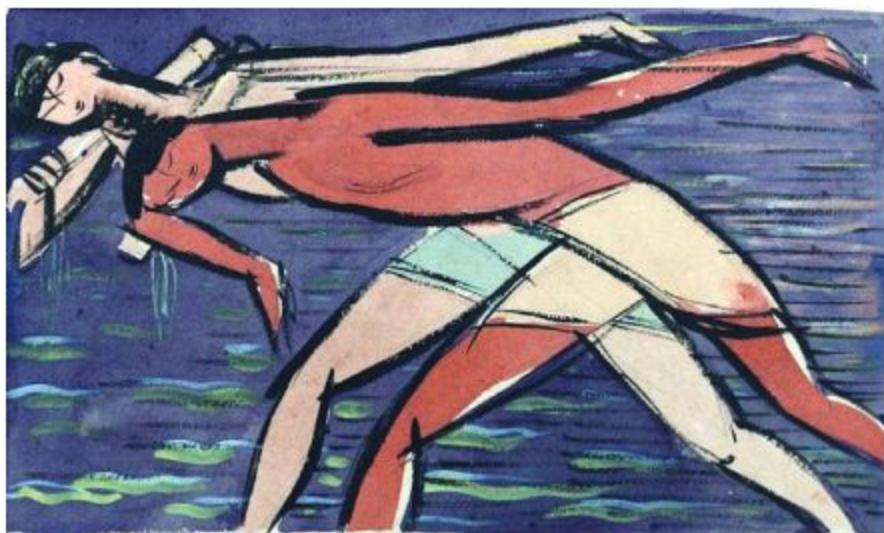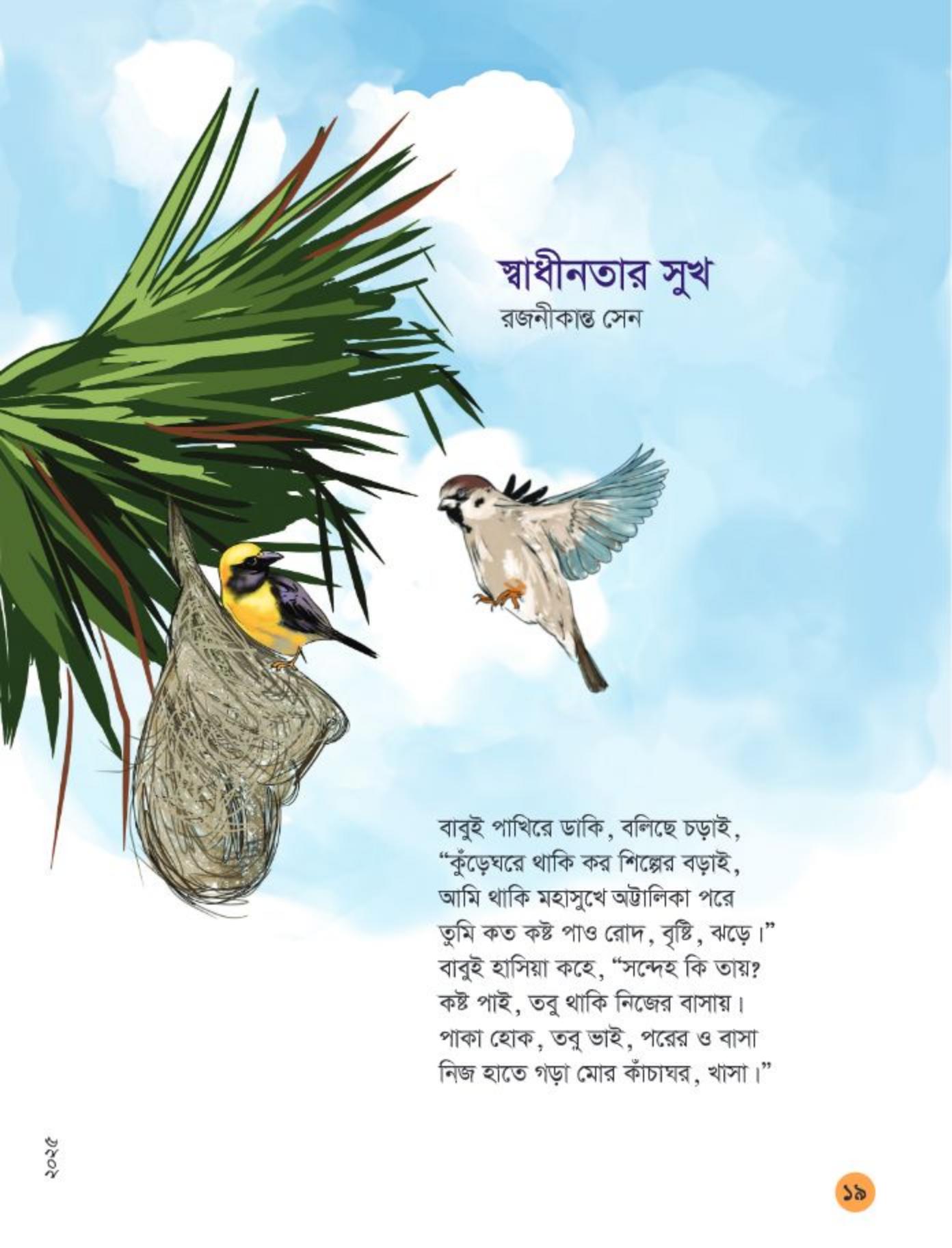
স্বাধীনতার সুখ

রজনীকান্ত সেন

বাবুই পাখিরে ডাকি, বলিছে চড়াই,
"কুঁড়েঘরে থাকি কর শিল্পের বড়াই,
আমি থাকি মহাসুখে অট্টালিকা পরে
তুমি কত কষ্ট পাও রোদ, বৃষ্টি, ঝড়ে।"
বাবুই হাসিয়া কহে, "সন্দেহ কি তায়?
কষ্ট পাই, তবু থাকি নিজের বাসায়।
পাকা হোক, তবু ভাই, পরের ও বাসা
নিজ হাতে গড়া মোর কাঁচাঘর, খাসা।"

২০২৫

অনুশীলনী

১. জেনে নিই

বাবুই খুব সুন্দর করে নিজের বাসা বোনে গাছের ডালে। সেখানেই সে থাকে। আর চড়ুই থাকে অট্টালিকায়। অন্যের আশ্রয়ে থেকে চড়ুইয়ের অহংকারের শেষ নেই। বাবুইকে সে বাঁকা কথা বলে। কিন্তু বাবুই তাতে দুঃখ পায় না। রোদ, বৃষ্টি, ঝড়ে কষ্ট পেলেও বাবুই নিজের ঘরে থাকে। নিজের হাতে বানানো কাঁচা ঘরটাতেই সে সুখী। কবিতাটিতে বোঝানো হয়েছে, নিজের চেষ্টায় অল্প অর্জনও অধিক গৌরবের।

২. শব্দগুলো খুঁজে বের করি, অর্থ বলি ও বাক্য তৈরি করি।

স্বাধীনতা　কুঁড়েঘর　শিল্প　অট্টালিকা　খাসা

৩. শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করি।

ক. কুঁড়েঘরে থাকি কর শিল্পের .... ।

খ. আমি থাকি মহাসুখে .... পরে।

গ. বাবুই হাসিয়া কহে .... কি তায়?

ঘ. কষ্ট পাই, তবু থাকি .... বাসায়।

ঙ. নিজ হাতে গড়া মোর কাঁচা ঘর .... ।

৪. বিপরীত শব্দ বলি ও লিখি

সুখ –

কষ্ট –

পাকা –

স্বাধীনতা –

খাসা –

৫. সাজিয়ে লিখি

ক. থাকি কুঁড়েঘরে কর বড়াই শিল্পের

খ. বাসায় কষ্ট থাকি পাই তবু নিজের

গ. বাবুই চড়াই ডাকি পাখিরে বলিছে

ঘ. মোর নিজ ঘর খাসা হাতে গড়া কাঁচা

ঙ. মহাসুখে আমি অট্টালিকা থাকি পরে

৬. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. চড়াই বাবুইকে ডেকে কী বলে?

খ. বাবুই পাখি কষ্ট পায় কেন?

গ. চড়াই কোথায় থাকে?

ঘ. কার ঘরটি খাসা?

ঙ. কষ্ট পেলেও বাবুইয়ের মনে দুঃখ নেই কেন?

৭. কবিতাটি থেকে কী শিখলাম তা নিয়ে পাঁচটি বাক্য লিখি।

আজকে আমার ছুটি চাই

শাহীন লেখাপড়ার ফাঁকে ফাঁকে বাবা-মার কাজে সাহায্য করে। ওর বোনটা অনেক ছোটো। সে ছোটো বোনের দেখাশোনাও করে। নিয়মিত স্কুলে যায়। কিন্তু একদিন শাহীন স্কুলে যেতে পারল না। কারণ ছোটো বোনটার অসুখ করেছে। বাবাও বাড়িতে নেই। এমন অবস্থায় সে স্কুলে যায় কী করে?

শাহীন দুটি চিঠি লিখল। একটি চিঠি তার ক্লাসের বন্ধু শেখরকে, অন্যটা তার স্কুলের প্রধান শিক্ষককে। শাহীনের চিঠিটা প্রধান শিক্ষককে পৌঁছে দেবে শেখর।

তার প্রথম চিঠিটা এরকম

সফেদপুর
১১.০২.২০২৫

প্রিয় শেখর,

আমি আজ স্কুলে যেতে পারব না। আমার ছোটো বোনটার খুব অসুখ। আর বাবাও বাড়ি নেই। তিনি সন্ধ্যায় আসবেন। প্রধান শিক্ষক বরাবর আমার লেখা চিঠিটা অবশ্যই পৌঁছে দেবে। দিনের সব পড়া ভালো করে দেখবে ও লিখে নেবে। বাবা বাড়ি এলে তোমার কাছ থেকে আমি সব পড়া দেখে নেব। তোমার গল্পের বইটাও নিয়ে আসব।

আজকে স্কুলের লাইব্রেরি থেকে খেলার বইটা নিতে ভুলবে না যেন।

ইতি
তোমার বন্ধু
শাহীন

বন্ধু শেখরকে লেখা চিঠিটা ভাঁজ করে অপর পৃষ্ঠায় লিখল:

শেখর চন্দ্র সরকার

গ্রাম : আড়াইপাড়

(উত্তর পাড়া)

তার দ্বিতীয় চিঠিটা এরকম

তারিখ: ১১.০২.২০২৫

বরাবর

প্রধান শিক্ষক

ইছাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

সফেদপুর, ঢাকা।

বিষয়: ছুটির আবেদন।

মহোদয়

সবিনয় নিবেদন এই যে, আমার ছোটোবোন খুব অসুস্থ। বাবা বাড়ি নেই। তিনি সন্ধ্যায় আসবেন। ছোটোবোনকে দেখাশোনা করতে হবে বলে আমার পক্ষে আজ বিদ্যালয়ে আসা সম্ভব নয়।

অতএব মহোদয়ের নিকট আবেদন, আমাকে আজ ছুটি প্রদান করলে আমি বাধিত হব।

নিবেদক

আপনার অনুগত ছাত্র

শাহীন রহমান

চতুর্থ শ্রেণি

ক্রমিক নম্বর- ০২

প্রধান শিক্ষককে লেখা চিঠিটা ভাঁজ করে একটা খামে পুরল শাহীন।

সে খামের বাম পাশে লিখল	সে খামের ডান পাশে লিখল
প্রেরক শাহীন রহমান চতুর্থ শ্রেণি পিতা : বদিউর রহমান গ্রাম : সফেদপুর জেলা : ঢাকা পোস্ট কোড : ১৩৪৫	**প্রাপক** প্রধান শিক্ষক ইছাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ডাকঘর : ইছাপুর জেলা : ঢাকা পোস্ট কোড : ১৩৪৪

শাহীনের লেখা চিঠিটা পেয়ে শেখর সবকিছু ঠিক মতোই করেছিল। প্রধান শিক্ষকও ঠিকই জেনে গিয়েছিলেন ব্যাপারটা। তিনি চিঠিটার গায়ে ছুটি মঞ্জুরের কথা লিখে দিয়ে সই করে দিলেন। শেখরকেও স্যার জানিয়ে দিলেন যে, শাহীনকে একদিনের ছুটি দেওয়া হয়েছে।

আমরা প্রয়োজনে এই রকম চিঠি লিখে জরুরি কাজ ও সমস্যা মোকাবিলা করতে পারি। চিঠি লেখার অভ্যাস করতে হয়। জানতে হয় কোন চিঠি কখন, কাকে এবং কীভাবে লিখতে হবে।

এখানে দু'ধরনের চিঠি বা পত্রের কথা বলা হয়েছে। শাহীন বন্ধু শেখরকে যে চিঠি লিখেছে সেটি হলো ব্যক্তিগত পত্র। প্রধান শিক্ষককে যে চিঠিটি সে লিখেছে তাকে বলে আবেদনপত্র।

অনুশীলনী

১. জেনে নিই।

ক. চিঠি কয়েক রকম হতে পারে। যেমন–ব্যক্তিগত চিঠি, পারিবারিক চিঠি, নিমন্ত্রণ পত্র, ব্যবসায়িক চিঠি, দাপ্তরিক চিঠি, অনুরোধ পত্র বা আবেদন পত্র ইত্যাদি।

খ. চিঠির মধ্যে সাধারণত কয়েকটি অংশ থাকে। যেমন–

১. যেখান থেকে চিঠি লেখা হচ্ছে সে জায়গার নাম, ঠিকানা ও তারিখ
২. সম্বোধন বা সম্ভাষণ
৩. মূল বক্তব্য (ভেতরে যে কথাগুলো থাকে)
৪. বিদায় সম্ভাষণ (পত্রের ইতি টানা)
৫. প্রেরকের (যে চিঠি পাঠাচ্ছে তার) নাম ও ঠিকানা
৬. প্রাপকের (যে চিঠি পাবে তার) নাম ও ঠিকানা

২. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. শাহীন কেন চিঠি লিখেছিল?
খ. শাহীন কাকে কাকে চিঠি লিখেছিল?
গ. বন্ধু শেখরকে কেন শাহীন চিঠি লিখেছিল?
ঘ. চিঠি লেখার ফলে শাহীনের কী লাভ হয়েছিল?
ঙ. চিঠিতে সাধারণত কয়টি অংশ থাকে?

৩. শূন্যস্থান পূরণ করি।

চিঠির প্রথম অংশ ....। দ্বিতীয় অংশ...।
তৃতীয় অংশ...। চতুর্থ অংশ ....।
পঞ্চম অংশ ....। ষষ্ঠ অংশ ....।

৪. পত্র লিখি।

ক. দাদুর কাছে একটা ব্যক্তিগত চিঠি লিখি।
খ. পাশের স্কুলের সাথে অনুষ্ঠিত ফুটবল খেলা দেখার জন্য চতুর্থ শ্রেণির পক্ষ থেকে ছুটি চেয়ে প্রধান শিক্ষকের নিকট একটা আবেদন পত্র লিখি ।

৫. লিখল, দেবে, করছে, দেখবে, আসব, পারছি, লিখব, করলেন, জানতে – এগুলো সবই ক্রিয়াপদ। যার দ্বারা কোনো কাজ করা বোঝায় তাকে ক্রিয়াপদ বলে।

বীরশ্রেষ্ঠদের বীরগাথা

১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ। অবিস্মরণীয় সেই সময়। শুরু হয়ে গেছে মুক্তিযুদ্ধ। বাঙালিরা ঝাঁপিয়ে পড়েছেন স্বাধীনতার মরণপণ যুদ্ধে। সারা বাংলাদেশ তখন রণক্ষেত্র। হানাদার পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে যেভাবেই হোক পরাজিত করতে হবে। শত্রুমুক্ত করতে হবে এই প্রিয় মাতৃভূমিকে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব পেশার মানুষ যোগ দিচ্ছে মুক্তিযুদ্ধে। এঁরা সবাই মুক্তিযোদ্ধা, গঠিত হয়েছে মুক্তিবাহিনী। এঁদের সবাই সে সময় জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করেছেন। অনেকেই শহিদ হয়েছেন। এঁদের মধ্যে সাতজনকে অসীম সাহসিকতার জন্য রাষ্ট্র বীরশ্রেষ্ঠ উপাধিতে ভূষিত করে। এই বীরশ্রেষ্ঠরা হলেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর, মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল, হামিদুর রহমান, মোহাম্মদ রুহুল আমিন, মতিউর রহমান, মুন্সী আবদুর রউফ এবং নূর মোহাম্মদ শেখ। এখানে আমরা তিনজন বীরশ্রেষ্ঠর কথা জানব।

ডিসেম্বরের ১৪ তারিখ। একজন মুক্তিযোদ্ধা চাঁপাইনবাবগঞ্জের বারঘরিয়ার মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প থেকে বের হয়ে রেহাইচরের কাছ দিয়ে নৌকায় করে মহানন্দা নদী পার হন। তারপর অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাদের বাংকারে আক্রমণ চালান। ধ্বংস করেন তাদের সুরক্ষিত বাংকার। পাকিস্তানি সেনাদের ঘাঁটিতে এ খবর পৌছালে তারা অধিক সংখ্যক সৈন্য এনে পাল্টা আক্রমণ চালায়। সাহসী এ যোদ্ধা তখন আরও দুঃসাহসী হয়ে ওঠেন। পিছিয়ে যাওয়ার মানুষ তিনি ছিলেন না। আকস্মিকভাবে পাকিস্তানি সেনাদের গুলি এসে তাঁর কপালে লাগে। তিনি মাটিতে পড়ে যান। এই খবর বারঘরিয়া মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে পৌছালে অন্য মুক্তিযোদ্ধাগণ পাকিস্তানি সেনাদের উপর মরণপণ আক্রমণ চালান। ওই দিনই তাঁরা চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহর হানাদার মুক্ত করেন।

এভাবে শহিদ হন একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। বীরের রক্তে রঞ্জিত হলো বাংলার মাটি। স্বাধীনতার জন্য লড়াই করা অসীম সাহসী এই বীরের নাম ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর।

ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর

মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরের জন্ম ১৯৪৯ সালের ৭ই মার্চ, বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলার রহিমগঞ্জ গ্রামে। মুক্তিযুদ্ধ যখন শুরু হয়, তখন তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে ছিলেন। তিন সহকর্মীসহ সিদ্ধান্ত নিলেন, পাকিস্তান সামরিক বাহিনী ত্যাগ করে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেবেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী তাঁরা চার জন ৩রা জুলাই রাতের অন্ধকারে পাকিস্তানের শিয়ালকোট হয়ে ভারতে প্রবেশ করেন। সেখান থেকে দিল্লি হয়ে কলকাতায় পৌছান। চারজন বীর সেনাকে স্বাগত জানান মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি জেনারেল আতাউল গনি ওসমানী। ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীরকে পাঠানো হয় ৭ নম্বর সেক্টরে। সেখান থেকে তিনি মালদহ জেলার মেহেদিপুর মুক্তিবাহিনী ক্যাম্পে যোগ দেন। তিনি এই সাব-সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন। যুদ্ধে সাহস ও ক্ষিপ্রতার কারণে তাঁর আক্রমণের ধারা ছিল ভিন্ন। অনেকগুলো অপারেশনে নেতত্ব দিয়ে শত্রুসেনাদের খতম করেন তিনি। সেক্টর কমান্ডার কাজী নুরুজ্জামান তাঁর বইয়ে মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর সম্পর্কে লিখেছেন, 'মহিউদ্দীন ছিলেন একজন অনন্য সাধারণ দেশপ্রেমিক এবং যোগ্য সেনানায়ক। বিজয় দিবসের দুই দিন আগে এই অসীম সাহসী মুক্তিযোদ্ধা শহিদ হন।

জাহাঙ্গীরের মতোই ভাবনা ছিল বৈমানিক মতিউর রহমানের। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তিনি করাচির মাসরুর বিমান ঘাঁটিতে কর্মরত ছিলেন। তিনিও চেয়েছিলেন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এসে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে। পাকিস্তানি বিমানবাহিনীতে মতিউর ছাত্রদের বিমান প্রশিক্ষণের দায়িত্বে ছিলেন। তাঁর একজন ছাত্রের নাম ছিল রশিদ মিনহাজ। মিনহাজ ছিলেন শিক্ষানবিস পাইলট। তিনি পরিকল্পনা করলেন যে, মিনহাজ যেদিন বিমান নিয়ে আকাশে উড়বে, সেদিন তার কাছ

থেকে বিমানটি ছিনিয়ে ভারতে নিয়ে যাবেন। নোটিশ বোর্ডে টানানো ফ্লাইট শিডিউল দেখে তিনি জেনেছিলেন আগস্ট মাসের ২০ তারিখে মিনহাজ আকাশে উড়বেন। সেদিন তিনি গাড়ি নিয়ে রানওয়ের পূর্বদিক চলে যান। মতিউর দেখতে পান, মিনহাজ টি–৩৩ বিমান চালিয়ে সামনের দিকে আসছেন। তিনি বিমানের সামনে গিয়ে তাকে থামতে বলেন। মিনহাজ থামেন এবং বিমানের উপরের ঢাকনা খুলে কোনো সমস্যা হয়েছে কি না তা জানতে চান। সুযোগ পেয়ে মতিউর লাফ দিয়ে বিমানে ওঠেন। আগেই রুমালে ক্লোরোফরম মাখিয়ে এনেছিলেন তিনি। মিনহাজের নাকে রুমাল চেপে ধরতেই তিনি অচেতন হয়ে যান। কিন্তু তার আগেই মিনহাজ কন্ট্রোল টাওয়ারে খবর পাঠান যে, বিমানটি হাইজ্যাক হয়েছে। মতিউর রহমান খুব নিচু দিয়ে অনেকটা পথ আসার পরে মিনহাজের জ্ঞান ফিরে। তিনি বিমানটিকে ফেরানোর জন্য ধস্তাধস্তি শুরু করেন। এক পর্যায়ে বিমানটি পাকিস্তানের থাট্টায় বিধ্বস্ত হয়। বিধ্বস্ত বিমানের বাইরে পড়ে ছিল মতিউর রহমানের প্রাণহীন দেহ। পরে তাঁকে মাসরুর বিমানঘাঁটিতে কবর দেওয়া হয়। ২০০৬ সালে তাঁর দেহাবশেষ দেশে ফিরিয়ে আনা হয়। রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁকে সমাহিত করা হয় ঢাকার মিরপুরের শহিদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে। মতিউর রহমান ১৯৪১ সালে ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তিনি ছিলেন পাকিস্তান বিমান বাহিনীর ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট।

ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান

মুক্তিযুদ্ধের আরেক অসীম সাহসী যোদ্ধা বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান। ১৯৫৩ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি তিনি ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর থানার খর্দ খালিশপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। দুঃসাহসিক এক যুদ্ধে তিনিও জীবন দিয়েছিলেন।

১৯৭১ সালের ২৮শে অক্টোবর। মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ থানার ধলই সীমান্ত ফাঁড়ি। মুক্তিযোদ্ধারা গুরুত্বপূর্ণ এই ফাঁড়িটি দখল করার সিদ্ধান্ত নেন। দায়িত্ব দেওয়া হয় প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ওপর। নেতৃত্ব পান তরুণ সিপাহি হামিদুর রহমান। তিন প্লাটুন সৈন্য নিয়ে তিনি যাত্রা শুরু করেন। রাতের আঁধারে অত্যন্ত সাবধানে তাঁরা গ্রেনেড ছুড়ে শত্রুর বাংকার নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন। কিন্তু তখনই শত্রুর পুঁতে রাখা একটা মাইন বিস্ফোরিত হয়। পাকিস্তানি সেনারা সতর্ক হয়ে যায়। দুই পক্ষে বেধে যায় তুমুল যুদ্ধ।

সিপাহি হামিদুর রহমান

হামিদুরের সঙ্গে শুধু একটা রাইফেল আর দুটো গ্রেনেড। নির্ভুল নিশানায় তিনি প্রথম গ্রেনেডটা ছোড়েন। শত্রুর আক্রমণকে স্তব্ধ করে দেন তিনি। কিন্তু দ্বিতীয় গ্রেনেডটা ছোড়ার মুহূর্তে শত্রুর মেশিনগানের গুলি এসে লাগে তাঁর গায়ে। শহিদ হন এই অকুতোভয় বীর। সিপাহি হামিদুরকে প্রথমে ত্রিপুরার আমবাসা ইউনিয়নের হাতিমারাছড়া গ্রামে সমাহিত করা হয়। ২০০৭ সালের ১০ই ডিসেম্বর তাঁর দেহাবশেষ ফিরিয়ে আনা হয় বাংলাদেশে। পরদিন রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় মিরপুর শহিদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে তাঁকে পুনরায় সমাহিত করা হয়।

তিনজন বীরশ্রেষ্ঠর কথা জানলাম আমরা। এক মহান বীরগাথার রচয়িতা তাঁরা। তাঁদের মতো অনেকের জীবনের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীন বাংলাদেশ। এই বীরদের মহান আত্মত্যাগ অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

(তথ্যসূত্র: মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়)

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি, অর্থ বলি এবং বাক্য তৈরি করে লিখি।

বীরশ্রেষ্ঠ বাঙ্কার বীরগাথা ধূলিসাৎ রণক্ষেত্র মুক্তিবাহিনী নিয়ন্ত্রণ
অতিক্রম বিধ্বস্ত হওয়া দুঃসাহসিক বিস্ফোরণ মেশিনগান অকুতোভয়

২. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. বীরশ্রেষ্ঠরা কেন মুক্তিযুদ্ধ করেছিলেন?

খ. ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর কীভাবে ঝুঁকি নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন?

গ. যুদ্ধবিমানের নিয়ন্ত্রণ নিতে গেলে মতিউরের কী ঘটেছিল?

ঘ. বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান যে অসীম সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন তার বর্ণনা দিই।

ঙ. 'এক মহান বীরগাথার রচয়িতা তাঁরা'— ব্যাখ্যা করি।

৩. তারিখবাচক শব্দ শিখি।

পাঠে আছে '১৯৫৩ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি' – এখানে ব্যবহৃত '২রা' শব্দটি হলো তারিখবাচক শব্দ। এরকম ১০ পর্যন্ত বলতে ও লিখতে হয় এভাবে :

১লা	(পহেলা)	৬ই	(ছয়ই)
২রা	(দোসরা)	৭ই	(সাতই)
৩রা	(তেসরা)	৮ই	(আটই)
৪ঠা	(চৌঠা)	৯ই	(নয়ই)
৫ই	(পাঁচই)	১০ই	(দশই)

৪. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিই।

ক. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে জীবন উৎসর্গকারী বীরশ্রেষ্ঠ কতজন?

১. ৩ জন   ২. ৫ জন

৩. ৭ জন   ৪. ৯ জন

খ. বীরশ্রেষ্ঠ মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর কীভাবে যুদ্ধ করেছিলেন?

১. মেশিনগান থেকে গুলি ছুড়েছিলেন

২. ট্যাংক নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন

৩. পাকিস্তানি সেনাদের বাংকারে আক্রমণ চালিয়েছিলেন

৪. বিমান থেকে আক্রমণ করেছিলেন

২০২৫

গ. মতিউর রহমানের বিমানটি কোথায় বিধ্বস্ত হয়েছিল?

১. ভারতের শ্রীনগরে　　২. পাকিস্তানের থাট্টায়

৩. বাংলাদেশের মেহেরপুরে　　৪. ভারতের ত্রিপুরায়

ঘ. কমলগঞ্জ থানার ধলই সীমান্ত ফাঁড়িটি দখলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কে?

১. হামিদুর রহমান　　২. মতিউর রহমান

৩. মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর　　৪. মোস্তফা কামাল

৫. বড়োদের কাছ থেকে মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা জানার চেষ্টা করি। তাঁদের কাছে শোনা ঘটনা বন্ধুদের কাছে বলি।

৬. নিচের ছবিটি অবলম্বনে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে আমার ভাবনা লিখে জানাই।
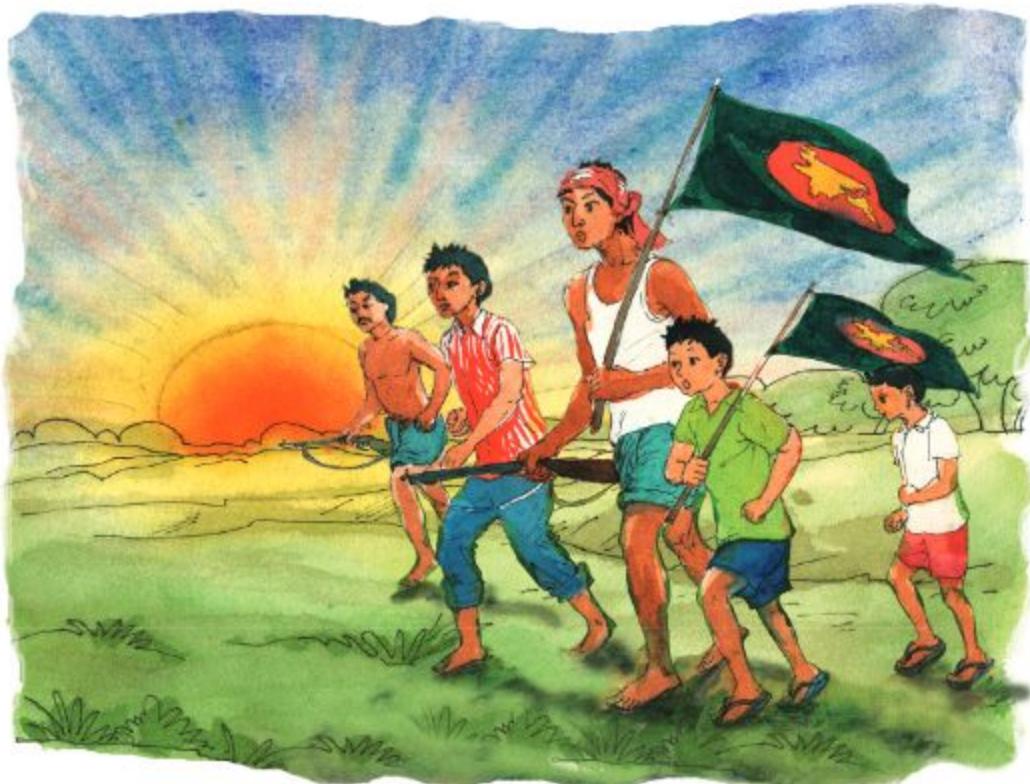
মহীয়সী রোকেয়া

মহীয়সী রোকেয়া

সে অনেক দিন আগের কথা। রংপুরের পায়রাবন্দ গ্রাম। সেই গ্রামেই জন্ম হলো এক ফুটফুটে শিশুর। নাম তার রোকেয়া। রোকেয়ার দুই বোন আর দুই ভাই। বাবা জমিদার। কিন্তু সেই জমিদারি তখন পড়তির দিকে। আগের অবস্থা আর নেই।

সকালে রোকেয়ার ঘুম ভাঙে পাখির ডাকে। পাখিদের তো ডানা আছে। পাখিরা উড়তে পারে। যখন যেখানে খুশি যেতে পারে। কিন্তু রোকেয়ার কোথাও যাওয়ার অনুমতি নেই। ঘরের বাইরে তো দূরের কথা, কারো সামনে যাওয়াও নিষেধ। এমনকি সে যদি মেয়ে হয়, তার সামনেও নয়।

একবার হলো কী, কয়েকজন মেয়ে-আত্মীয় রোকেয়াদের বাড়িতে বেড়াতে এলেন। রোকেয়ার বয়স তখন পাঁচ বছর। চার দেয়ালের মধ্যে বন্দি রোকেয়ার তো খুশি হবার কথা। কিন্তু তাকে কখনো চিলেকোঠায়, কখনো সিঁড়ির নিচে, কখনো দরজার আড়ালে লুকিয়ে থাকতে হলো। ছেলে মেয়ে কারো সামনে আসাই যে নিষেধ। মেয়েদের যে এভাবে চলতে হতো, একেই বলে অবরোধ প্রথা। অবরোধ মানে বাড়ির নির্দিষ্ট গন্ডির মধ্যে আটকে থাকা। শুধু মেয়ে হবার কারণে রোকেয়াকে এভাবে কাটাতে হতো বন্দিজীবন। সেকালে মেয়েদের লেখাপড়ারও চল ছিল না।

আসলে মুসলমান মেয়েদের তখন স্কুলে যেতেই দিতেন না অভিভাবকরা। রোকেয়া স্কুলে যাবেন কী করে? লেখাপড়াই-বা শিখবেন কীভাবে?

কিন্তু তিনি তো দমবার পাত্রী নন। বাড়িতে কুরআন পড়া শিখলেন। উর্দুও শিখলেন। কিন্তু বাংলা শেখার জন্যে তাঁর মন ছটফট করতে লাগল। রোকেয়ার বড় বোন করিমুন্নেসা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইব্রাহিম সাবের। করিমুন্নেসা তাঁর বড় ভাইয়ের কাছে লেখাপড়া শিখেছিলেন। ভাই বোন দুজনেই রোকেয়াকে খুবই স্নেহ করতেন। এই ভাই-বোনের কাছেই রোকেয়ার যত আবদার। রোকেয়ার লেখাপড়া করার কী অদম্য আগ্রহ! বড় বোনের কাছে তিনি বাংলা শিখলেন।

সেই লেখাপড়াটা ছিল আরেক যুদ্ধ। রাত গভীর হলে ভাইয়ের কাছে শুরু হতো তার জ্ঞানার্জন। বাবা-মা তখন গভীর ঘুমে। সারা বাড়ি নিজ্‌ঝুম। মোমবাতি জ্বালিয়ে রোকেয়া বই খুলে বসেছেন। এ বই সে বই থেকে ভাই সাবের তাকে পাঠ দিচ্ছেন। জ্ঞানের জন্যে তৃষ্ণার্ত বোন রোকেয়া শিখছেন কত কিছু। রাতের পর রাত এভাবেই কেটে গেছে। কখনো কখনো পড়তে পড়তে ভোর হয়ে গেছে। লুকিয়ে লুকিয়ে এভাবেই পড়া শিখেছেন রোকেয়া।

আসলে সেই সময়টা ছিল এমনই। মেয়েদের না ছিল লেখাপড়ার অধিকার, না ছিল বাইরে কোথাও বের হওয়ার স্বাধীনতা। সামাজিক বিধিনিষেধের কারণে মেয়েরা লেখাপড়া করতে পারত না। মেয়েদের বিয়ে দেওয়া হতো খুব অল্প বয়সে। এভাবেই বড়ো বোন করিমুন্নেসার চৌদ্দ বছর বয়সে

বিয়ে হয়ে গেল।

রোকেয়ার বিয়ে হলো ষোলো বছর বয়সে। স্বামী সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন। সরকারি চাকুরে। এবার স্বামীর নামানুসারে তাঁর নাম হলো রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন।

বিয়ের মাত্র দশ বছর পর রোকেয়ার স্বামী সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের মৃত্যু হলো। এবার শুরু হলো রোকেয়ার আরেক জীবন। মুসলমান মেয়েরা তখন অনেক পিছিয়ে। লেখাপড়া করার স্কুল নেই। মৃত্যুর আগে স্বামী কিছু অর্থ রেখে গিয়েছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর কলকাতায় স্বামীর নামে তিনি মেয়েদের একটা প্রাথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন। শুরুতে এই স্কুলের ছাত্রী ছিল মাত্র পাঁচজন। কিন্তু আস্তে আস্তে ছাত্রী সংখ্যা বাড়তে থাকল। তিনি বুঝতে পারলেন, কেন মুসলমান মেয়েরা এত পিছিয়ে আছে। কত কথা তাঁর মনে, কত কিছু বলবার ইচ্ছা। এবার তিনি বাংলা ভাষায় শুরু করলেন লেখালেখি। মনের কথা, মনের ভাবনা সব তুলে ধরলেন তাঁর লেখায়। তাঁর লেখা কয়েকটা উল্লেখযোগ্য বই হলো–'মতিচুর,' 'অবরোধবাসিনী' ও 'পদ্মরাগ।'

ছোটোবেলাতেই তিনি দেখেছিলেন, মেয়েদের ঘরে বন্দি করে রাখা হয়। তাদের পড়ালেখা করার অধিকার নেই। অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে স্বামীর ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সারাজীবন মেয়েরা আর কিছুই করতে পারে না। বাইরে কাজ করবার অধিকার তারা পায় না। পড়ালেখা করে ছেলেরা। বাইরে কাজ করে ছেলেরা। মেয়েরাও যে মানুষ, সে-কথাই তারা প্রায় ভুলে যায়। রোকেয়া বুঝেছিলেন, ছেলেদের যে অধিকার, মেয়েদেরও তো সেই অধিকার থাকবার কথা।

রোকেয়া বলেছেন, দুই চাকার কোনো গাড়ি চলতে হলে চাকা দুটোকে সমান হতে হয়। একটা চাকা ছোটো আরেকটা বড়ো হলে সেই গাড়ি সামনের দিকে এগোতে পারে না। সমাজে মেয়ে আর ছেলে হচ্ছে গাড়ির চাকার মতো। ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা যদি পিছিয়ে থাকে, সেই সমাজের উন্নতি হতে পারে না। তিনি সারাজীবন মেয়েদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করে গেছেন।

রোকেয়া ১৮৮০ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ১৯৩২ সালের ৯ই ডিসেম্বর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। নারী জাগরণের অগ্রদূত হিসেবে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন তিনি।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি, অর্থ বলি এবং বাক্য তৈরি করে লিখি।

জমিদার বন্দি চিলেকোঠা স্নেহ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা লেখালেখি উন্নতি
সমাজ অধিকার লড়াই নারী জাগরণ অগ্রদূত মহীয়সী চিরস্মরণীয়

২. নিচের শব্দগুলো দিয়ে বাক্য লিখি।

অগ্রদূত অধিকার প্রতিষ্ঠা অদম্য অবরোধ

৩. এককথায় প্রকাশ করি।

এই লেখায় "রোকেয়ার পড়ালেখা করার কী অদম্য আগ্রহ!" – এরকম একটা বাক্য রয়েছে। এই বাক্যে ব্যবহৃত 'অদম্য' শব্দটির অর্থ হচ্ছে, 'যে কোনো কিছুতে দমে না।' শব্দটি একটি বাক্যাংশের সংক্ষিপ্ত রূপ। এরকম আরও কিছু শব্দ শিখি।

অনেকের মধ্যে – অন্যতম।
জানার ইচ্ছা – জিজ্ঞাসা।
আকাশে যে চরে – খেচর।
বিদ্যা আছে যার – বিদ্বান।
ভাতের অভাব যার – হাভাতে।
মহান যে নারী – মহীয়সী।

৪. যুক্তবর্ণগুলো দেখি ও যুক্তবর্ণ দিয়ে গঠিত শব্দগুলো পড়ি ও লিখি।

জ্ঞান	জ্ঞ	জ্	ঞ	জ্ঞান, বিজ্ঞান, অজ্ঞান
উন্নতি	ন্ন	ন্	ন	অন্ন, ভিন্ন, নবান্ন

৫. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের ঠিক বাক্যাংশ মিলিয়ে পড়ি ও লিখি।

রংপুরের পায়রাবন্দ গ্রামে	ষোলো বছর বয়সে।
অবরোধ মানে বাড়ির নির্দিষ্ট	মতিচুর, অবরোধবাসিনী ও পদ্মরাগ।
রাত গভীর হলে ভাইয়ের কাছে	রোকেয়ার জন্ম।

২০২৫

রোকেয়ার বিয়ে হলো	নারী জাগরণের অগ্রদূত।
তাঁর লেখা বইগুলো হলো	শুরু হতো তার জ্ঞানার্জন।
মহীয়সী রোকেয়া	গন্ডির মধ্যে আটকে থাকা।

৬. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. বেগম রোকেয়া কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
খ. বাড়িতে লোক এলে রোকেয়া কোথায় কোথায় লুকিয়ে থাকতেন?
গ. লেখাপড়ার বিষয়ে রোকেয়াকে কে কে সাহায্য করতেন?
ঘ. রোকেয়া কখন পড়াশোনা করতেন? কীভাবে করতেন?
ঙ. সেকালে মেয়েদের অবস্থা কেমন ছিল?
চ. রোকেয়াকে কেন নারী জাগরণের অগ্রদূত বলা হয়?
ছ. নারীশিক্ষা কেন প্রয়োজন তা বুঝিয়ে বলি।

৭. স্বামীর মৃত্যুর পর রোকেয়া কী কী কাজ করতে শুরু করলেন তা সংক্ষেপে লিখি।

৮. রোকেয়ার জীবনী থেকে আমি কী শিখলাম তা সংক্ষেপে লিখি।

নেমন্তন্ন

অন্নদাশঙ্কর রায়

যাচ্ছ কোথা?
চাংড়িপোতা।
কিসের জন্য?
নেমন্তন্ন।
বিয়ের বুঝি?
না, বাবুজি।
কিসের তবে?
ভজন হবে।
শুধুই ভজন?
প্রসাদ ভোজন।
কেমন প্রসাদ?
যা খেতে সাধ।
কী খেতে চাও?
ছানার পোলাও।

ইচ্ছে কী আর?
সরপুরিয়ার।
আঃ কী আয়েস!
রাবড়ি পায়েস।
এই কেবলি?
ক্ষীর কদলী।
বাঃ কী ফলার!
সবরি কলার।
এবার থামো।
ফজলি আমও।
আমিও যাই?
না, মশাই।

অনুশীলনী

১. জেনে নিই।

এই ছড়াটিতে আসলে একটা হাসির গল্প বলা হয়েছে। একজন লোক ভজন গান শুনতে চাথড়িপোতা নামের একটা জায়গায় যাচ্ছে। পথে এক বন্ধুর সাথে দেখা। বন্ধু একটার পর একটা প্রশ্ন করছে, আর সে উত্তর দিয়ে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে বোঝা গেল – ভজন গান শোনার চেয়ে তার অনেক বেশি লোভ ভোজনে, অর্থাৎ ভালো ভালো খাবার খাওয়ায়। তার বন্ধু সঙ্গে যেতে চাইলেও সে তাকে নেয় না। কারণ, বন্ধু সঙ্গে গেলে তার খাওয়া যদি কম হয় – এই ভয়।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি, অর্থ বলি এবং বাক্য তৈরি করে বলি ও লিখি।

ভজন প্রসাদ ভোজন সাধ সরপুরিয়া আয়েস রাবড়ি ক্ষীর
কদলী ফলার ফজলি আম সবরি কলা

৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে বলি ও লিখি।

ক. লোকটি কোথায় যাচ্ছে? কেন যাচ্ছে?
খ. এ কবিতায় কী কী খাবারের নাম উল্লেখ আছে?
গ. কোন খাবার সে আয়েস করে খেতে চায়?
ঘ. লোকটি কোন কোন ফল খেতে চায়?
ঙ. সে কোন আম খেতে চাইছে?
চ. ভজন আর ভোজনের মধ্যে পার্থক্য কী?

৪. লোকটি কী কী খাবার খেতে চাইছে তার তালিকা বানাই।

৫. নেমন্তন্ন সম্পর্কে নিজের কোনো মজার ঘটনা বলি।

৬. আমার প্রিয় খাবারের নাম লিখি এবং কেন প্রিয় তা লিখি।

৭. একই অর্থ হয় এমন শব্দগুলো জেনে নিই।

নেমন্তন্ন – নিমন্ত্রণ, দাওয়াত।
সাধ – ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, বাসনা, কামনা।
বিয়ে – বিবাহ, পরিণয়, সাদি।

৮. ডান দিক থেকে ঠিক শব্দ বেছে নিয়ে খালি জায়গায় বসাই।

ক. লোকটি আয়েশ করে খেতে চায় ....।

খ. লোকটি চাংড়িপোতা যাচ্ছে ....।

গ. শুধু ভজন নয়, সাথে আছে ....।

ঘ. লোকটি খেতে চায় ....।

ঙ. বাঃ কী ফলার ....।

প্রসাদ ভোজন
সবরি কলার
রাবড়ি পায়েস
ভজন শুনতে
ছানার পোলাও

৯. ছড়াটি আবৃত্তি করি।

১০. ছড়াটি পড়ি ও ঠিকমতো বিরামচিহ্ন বসিয়ে লিখি।

কবি-পরিচিতি

অন্নদাশঙ্কর রায়
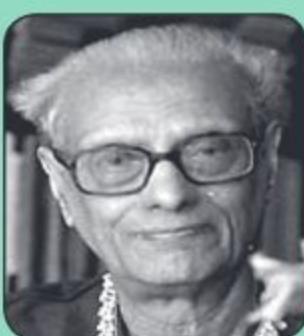
অন্নদাশঙ্কর রায় ১৯০৫ সালের ১৫ই মার্চ ভারতের উড়িষ্যা রাজ্যের ঢেকাঁনল জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে অনার্স নিয়ে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান লাভ করেন। সরকারি চাকরিতে যোগ দিয়ে ১৯২৬ সালে তিনি প্রশিক্ষণের জন্য বিলাত যান। তিনি একজন বিখ্যাত ছড়াকার। প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনি এবং উপন্যাসও লিখেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'পথে প্রবাসে', 'বিনুর বই', 'উড়কি ধানের মুড়কি', 'রাঙা ধানের খৈ' প্রভৃতি। অন্নদাশঙ্কর রায় ২০০২ সালের ২৮শে অক্টোবর কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

বই পড়তে অনেক মজা

পৃথিবীতে পশুপাখির জগৎ আছে, গাছপালা ও পোকামাকড়ের জগৎ আছে, মাছেদের জগৎ আছে, আছে আরো অনেক কিছু। পৃথিবী থেকে আকাশের দিকে তাকালে আরো অনেক জিনিস দেখা যায়। সেখানে গ্রহ আছে, তারা আছে, ছায়াপথ আছে। তেমনিভাবে বইয়েরও জগৎ আছে। পশুপাখি নিয়ে বই আছে, গাছপালা নিয়ে বই আছে, পোকামাকড় নিয়ে বই আছে, মাছ নিয়ে বই আছে, তারা নিয়ে বই আছে, গ্রহ নিয়ে বই আছে, ছায়াপথ নিয়ে বই আছে। পৃথিবীতে যা কিছু আছে, তার সব নিয়েই বই আছে। পৃথিবীর বাইরে যা কিছু আছে, তা নিয়েও অনেক বই আছে।

শুধু এক রকমের বই নয়, অনেক রকমের বই। ছোটোদের বই, বড়োদের বই, হাসির বই, কান্নার বই, গল্পের বই, ছবির বই, বিজ্ঞানের বই, ধর্মের বই, গণিতের বই, কবিতার বই, নাটকের বই, সিনেমার বই। বইয়ের কোনো শেষ নেই। যারা চোখে দেখতে পায় না তাদের জন্যও বই আছে। তারা বইয়ের পাতায় হাত দিয়ে দিয়ে পড়ে।

আমরা স্কুলে প্রতিদিন বই পড়ি। এগুলো হলো পাঠ্যবই। পাঠ্যবইয়ের বাইরেও অনেক মজার মজার বই আছে। পঞ্চতন্ত্রের গল্প, ঈশপের গল্প, আরব্য রজনীর গল্প– এগুলো ছোটোদের খুব প্রিয়। ঠাকুরমার ঝুলি আর গ্রিম ভাইদের রূপকথা পড়তে বসলে আর উঠতে মন চায় না। রবিনসন ক্রুসো, আশি দিনে বিশ্বভ্রমণ, টম সয়ারের অভিযান– এই বইগুলো সারা দুনিয়ার শিশুদের প্রিয়।

ছোটোদের জন্য এতো এতো মজার বই আছে যে, তা লিখে শেষ করা যাবে না। বাংলাদেশে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, সুকুমার রায় আর হুমায়ূন আহমেদের বই ছোটোদের খুব প্রিয়।

সুকুমার রায়ের ছড়ার বই ছেলে-বুড়ো সবাই পড়ে। পড়লে খুব হাসি পায়। আবার হুমায়ূন আহমেদের ভূতের গল্প পড়লে গা ছমছম করে। আর উপেন্দ্রকিশোর রায়ের টুনটুনির গল্প, বাঘের গল্প– এগুলো কখনো পুরোনো হয় না। বারবার পড়তে ইচ্ছে করে।

শুধু মজা আর হাসি নয়, বই পড়ে অনেক কিছু জানাও যায়। মানুষ কীভাবে চাঁদে গেল, কীভাবে দক্ষিণ মেরুতে গেল, কীভাবে এভারেস্ট পর্বতের মাথায় উঠল, কীভাবে ইঞ্জিন আবিষ্কার করল, কীভাবে কম্পিউটার আবিষ্কার করল– এসব কিছু জানা যায়। শুধু তাই নয়, বিজ্ঞানীরা বলেন, বই পড়লে শরীর ও মন ভালো থাকে। যারা বই পড়ে, তারা ভালো লিখতে পারে, ভালো বলতে পারে।

কিন্তু একসময় পৃথিবীতে বই ছিল না। বই ছাপানোর ব্যবস্থাও ছিল না। তখন মানুষ তালপাতায় লিখত, পাথরে লিখত, গাছের ছাল-বাকলে লিখত। আজ থেকে প্রায় ছয়শো বছর আগে জার্মানিতে প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর সারা দুনিয়ায় ছাপাখানা ছড়িয়ে পড়ে। ছাপাখানায় এক বই যতো খুশি তৈরি করা যায়। ফলে এখন মানুষ একই বই যতো খুশি কিনতে পারে ও পড়তে পারে।

জন্মদিনে বা নানা ধরনের উৎসব ও প্রতিযোগিতায় বই উপহার দেওয়া হয়। বই উপহার দেওয়া খুব ভালো। ভালো বই কখনো পুরোনো হয় না। একটা ভালো বই হাজার বছর ধরে মানুষ পড়তে থাকে। একটা ভালো বই হাজার বছর ধরে মানুষের উপকার করতে থাকে। বইয়ের জগৎ জানার জগৎ, আনন্দের জগৎ।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ লিখি ও বাক্য তৈরি করি।

ছায়াপথ ঈশপ এভারেস্ট ছাপাখানা বিশ্বভ্রমণ

২. শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করি।

পুরনো পাঠ্যবই জানা শেষ শরীর ও মন

ক. আমরা স্কুলে প্রতিদিন .... পড়ি।

খ. বইয়ের কোনো .... নেই।

গ. বই পড়ে অনেক কিছু .... যায়।

ঘ. বই পড়লে .... ভালো থাকে।

ঙ. ভালো বই কখনো .... হয় না।

৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. বইয়ের জগৎ কোন জগতের মতো?

খ. বই কত রকমের হয়?

গ. কী পড়তে বসলে আর উঠতে মন চায় না?

ঘ. ছাপাখানা প্রথম কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়?

ঙ. বই সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা কী বলেছেন?

৪. পাঠে উল্লিখিত বইগুলোর একটি তালিকা প্রস্তুত করি।

৫. তোমার পড়া পাঁচটি বই ও তার লেখকের নাম লেখ।

৬. বই পড়ার গুরুত্ব নিয়ে পাঁচটি বাক্য লিখি।

২০২৫

আবোল-তাবোল

সুকুমার রায়

ছুটলে কথা, থামায় কে?
আজকে ঠেকায় আমায় কে?
আজকে আমার মনের মাঝে
ধাঁই ধপাধপ তবলা বাজে–
রাম-খটাখট ঘ্যাঁচাং ঘ্যাঁচ
কথায় কাটে কথার প্যাঁচ।
ঘনিয়ে এলো ঘুমের ঘোর,
গানের পালা সাঙ্গ মোর।

(অংশবিশেষ)

২০২৫

অনুশীলনী

১. জেনে নিই।

আবোল-তাবোল কথা বলার মানে মনের খেয়ালে কথা বলতে থাকা। আমরা কথা বলি যাতে অন্যে সে-কথা শোনে এবং শুনে কিছু একটা করে। যেমন, যদি বলি – মা, ভাত খাব। মা তখন আমায় ভাত দিতে ছুটবেন! কিন্তু যদি ভূতের মতো নাকি সুরে বলি 'আঁউ মাঁউ খাঁউ ভাঁতের গন্ধ পাউ' তখন মা ভাববেন, আমি খেলা করছি। সেটা তখন আবোল-তাবোল কথা হয়ে গেল, যে কথার অর্থ নেই, যে কথা দিয়ে কিছু বোঝাতে চাইছি না।

এটি সে-রকমই একটি ছড়া, যা জোরে জোরে পড়লেই শুনতে মজা লাগে। একটা লোক মনের আনন্দে কেবলই বকবক করে কথা বলে চলেছে, ইচ্ছে হলে গানও গাইছে। যতক্ষণ না দুচোখে ঘুম নামল, ততক্ষণ সে এমনটাই করে গেল।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

ঠেকায় তবলা ঘ্যাঁচাং ঘ্যাঁচ প্যাঁচ ঘুম ঘনিয়ে এলো সাজ্জা
রাম-খটাখট

৩. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

ঘনিয়ে এলো	সাজ্জা	ঘ্যাঁচাং ঘ্যাঁচ	ঠেকায়	মনের মাঝে	প্যাঁচ

ক. তুহিন লেখাপড়ায় এত ভালো যে ওকে .... কে?

খ. লোকটি .... করে গাছের ডালটি কেটে ফেলল।

গ. বসে থাকতে থাকতে তার ঘুম .... ।

ঘ. .... দেওয়া কথা বোঝা যায় না।

ঙ. তাড়াতাড়ি খেলাধুলা .... করো, পড়তে বসতে হবে।

চ. পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করায় তার .... আনন্দের ঢেউ বয়ে যায়।

৪. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে বলি ও লিখি।

ক. কী ছুটছে যাকে থামানো যাচ্ছে না?

খ. ধাঁই ধপাধপ আওয়াজে কোথায় তবলা বাজছে?

গ. কখন গানের পালা সাঙ্গ হলো?

ঘ. কথায় কী কাটে?

৫. ছড়াটিতে যা বলা হয়েছে তা বর্ণনা করি।

৬. ছড়াটি মুখস্থ করি ও বলি।

৭. বই না দেখে ছড়াটি লিখি।

৮. কর্ম-অনুশীলন।

ছড়ার মতো করে দুইটি লাইন লিখি।

কবি-পরিচিতি

সুকুমার রায়

শিশুসাহিত্যিক সুকুমার রায় ৩০শে অক্টোবর ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছোটোদের জন্য হাসির গল্প ও কবিতা লিখে বিখ্যাত হয়ে আছেন। 'আবোল-তাবোল', 'হ-য-ব-র-ল', 'পাগলা দাশু', 'বহুরূপী', 'খাইখাই', 'অবাক জলপান' তাঁর অমর সৃষ্টি। তাঁর পিতা উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীও শিশুসাহিত্যিক ছিলেন। পুত্র সত্যজিৎ রায় বিশ্ববিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক হলেও শিশু-কিশোরদের জন্য প্রচুর লিখেছেন। ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯২৩ সালে সুকুমার রায় মৃত্যুবরণ করেন।

হাত ধুয়ে নাও

অন্তু খুব হাসিখুশি ছেলে। পড়াশুনায় ভালো, খেলাধুলায়ও বেশ। কিন্তু একটু চঞ্চল। মামাকে মা জানিয়েছিল, আজকাল অন্তুর শরীরটা সব সময় ভালো যায় না। প্রিয় ভাগিনাকে অনেক দিন দেখেননি মামা। তাই ছুটি নিয়ে দেখতে এসেছেন।

অন্তু বাইরে খেলা করছিল। মামার আসার কথা শুনে ছুটে ঘরে চলে আসে। ঘরে ঢুকেই সুগন্ধটা পায় সে। মামার হাতে ওর প্রিয় খাবার বিরিয়ানি। বিরিয়ানি দেখেই মামার দিকে হাত বাড়ায় সে। তর সইছে না। প্যাকেট খুলে নিয়েই হাত দিয়ে খাবলে খেতে শুরু করে।

–“কী যে মজা, মামা...।” অন্তুর কথা শেষ না হতেই মামা ওর হাতটি সরিয়ে দেয় খাবার থেকে। বলেন, “অন্তু, এভাবে কেউ খায় নাকি?”

২০২৫

অন্তু গাল ফুলিয়ে হাতটাই চেটেপুটে খেতে থাকল। অমনি আবার মামা ওর হাত চেপে ধরলেন।

–"অন্তু, এভাবে খায় না।"
ভিতর থেকে মা'ও এসে অন্তুকে বকাবকি করলেন এভাবে খাওয়ার জন্য।

–"আহ্ বুবু, তুমি আবার বকছ কেন? এটা মামা-ভাগিনার ব্যাপার। আমি দেখছি।"

এবার মামা ওকে খাবার ঘরের পাশে হাত ধুতে নিয়ে গেলেন। সাবান দিয়ে অন্তুর হাত ধুইয়ে দিলেন। বিরিয়ানির প্যাকেটের পাশে বসিয়ে দিয়ে বলেন, "নাও এবার খাও। তোমার জন্যই তো আনা।" খেতে খেতে অন্তুর নাকে সর্দির পানি এসে যায়। ও সেটা বাঁ হাত দিয়ে টিপে শার্টে মুছে নেয়। মামা দেখে আবার চোখ পাকান।

মা বলতে থাকেন, "বুঝলি সান্টু, ছেলেটাকে এত দেখে-শুনে রাখি, তারপরেও দ্যাখ, আজকাল ওর যেন অসুখ-বিসুখ লেগেই থাকে। ভাবছি ভালো ডাক্তার দেখাব।"
বাবা তাতে যোগ করেন –"সান্টু, তোমার জানা ভালো ডাক্তার কেউ আছেন?"

"আচ্ছা, আমি দুদিন আছি। একটু দেখে নিই। মনে হয়, ওর কোনো বিশেষ অসুখ নেই। ওর দরকার স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে আরও সতর্ক হওয়া।" একটু পরেই দেখা গেল অন্তু টয়লেট থেকে বের হচ্ছে। তারপর সোজা ছুটে চলে গেল খেলতে।

সন্ধ্যায় মামা অন্তুর সঙ্গে কিছু সময় কাটালেন। ওর সারা দিনের চলাফেরা, মুখ-হাত ধোয়া, গোসল করা, খাওয়া-দাওয়া, সবকিছু সম্পর্কে আলোচনা করলেন। পরদিন বিকেলে অন্তুর সঙ্গে মামা মাঠে গেলেন। ঘরে ফিরে মামা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে অন্তুর মুখ-হাত ধোয়ালেন। মা দেখে মুচকি হেসে বলেই ফেললেন, "আমার কথা তো শোনো না বাছা। এখন মামা এসেছে বলে কত ভালো ছেলে।"

বাবা হেসে বললেন, "না, অন্তু তো বরাবর পরিষকার-পরিচ্ছন্ন আর ভালো ছেলে।"

মামা বলেন, "হ্যাঁ, ভালো ছেলে বটে, তবে পরিষকার-পরিচ্ছন্ন কতটা সেটাই তো দেখছি।"

তারপর অন্তুকে বাবা-মার সামনে বসিয়ে মামা বললেন, "আমি সব দেখলাম ভাগিনা। তোমার একটা অভ্যাস ভালো করতে হবে। আর তা হচ্ছে হাত ধোয়া। তুমি ঠিকমতো হাত ধোও না, হাত পরিষকার করো না। বিশেষ করে খাওয়ার আগে ও পরে আর টয়লেট করার পর। নাকের সর্দিও যেমন-তেমন করে মোছ। এগুলো মোটেই ভালো নয়। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রথম

কাজই হলো ঠিকমতো হাত ধোয়া। তোমার নখগুলো পরিষ্কার নয়। রোগবালাইয়ের শুরু কিন্তু এখান থেকেই।"

"দ্যাখো মামা, আমার হাত তো ... পরিষ্কার দেখাচ্ছে।" অন্তু বলার চেষ্টা করে।

মামা বললেন, "পরিষ্কার দেখালেই হাত আসলে পরিষ্কার হয় না। আমরা হাত দিয়ে অনেক কিছু ধরি, অনেকের সাথে হাত মেলাই। এই সব কিছুতেই জীবাণু থাকতে পারে যা হাতে লেগে যায়। খাওয়ার আগে অথবা টয়লেট করার পর সাবান দিয়ে হাত না ধুলে এমনটা হয়। এই রকম জীবাণু খালি চোখে দেখা যায় না। তাই ভালো করে হাত ধোয়া না হলে ওইসব জীবাণু খাবারের সঙ্গে আমাদের পেটে চলে যায়। আর বেশিরভাগ পেটের রোগ, সর্দি-জ্বর ওইসব জীবাণু থেকেই হয়। কাজেই কিছু খাওয়ার আগে দু হাত সাবান দিয়ে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিতে হবে।"

"এটা একটা অভ্যাস। ভালো করে হাত ধোয়ার অভ্যাস করলেই দেখবে তোমার অসুখ-বিসুখ কমে গেছে।"

অন্তুর বাবা বলেন, "আমিও তো অন্তুকে বলি। যখন বলি তখন করে। কিন্তু সব সময় কি করে?"

মা বললেন, "শুনলে তো বাবুসোনা! মামার কথা মনে থাকে যেন।"

মামা এবার অন্তুকে অনেক আদর করলেন। অন্তু খুশি হয়ে বলল, এখন থেকে সে খাওয়ার আগে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নিবে। টয়লেট করার পর খুব ভালোভাবে হাত ধোয়ার অভ্যাস করবে।

অন্তু আর যা-ই হোক, মামার কথা ফেলবে না। কারণ সে মামার মতো হতে চায়। ঘুমোতে যাবার আগে অন্তু মামার কাছে কথা দেয়, ঠিকমতো হাত ধোবে। সবাইকে বলবে, "যদি সুস্থ থাকতে চাও, তো হাত ধুয়ে নাও।"

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

চঞ্চল খাবলে খাওয়া চেটেপুটে অসুখ-বিসুখ টয়লেট জীবাণু ভাগিনা সতর্ক অভ্যাস

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

অসুখ-বিসুখ	চঞ্চল	খাবলে খেতে	চেটেপুটে	রোগ বালাই

ক. চড়ুই পাখি অনেক .... হয়।

খ. ক্ষুধার্ত লোকটি খাবার পেয়ে .... থাকল।

গ. মজার আচার পেয়ে সবাই .... খাচ্ছে।

ঘ. শরীরের যত্ন না নিলে .... লেগেই থাকবে।

ঙ. .... থেকে বাঁচার জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা চাই।

৩. বাংলা ভাষায় অনেক রকমের শব্দ রয়েছে। এদের মধ্যে বেশ কিছু বিদেশি। এই লেখাটিতে টয়লেট, বিরিয়ানি, জরুরি— এগুলো বিদেশি শব্দ। এরকম আরও শব্দ জেনে নিই এবং তা দিয়ে বাক্য রচনা করি।

রিক্সা, সরকারি, আদালত, বেঞ্চ, স্টেডিয়াম, স্টেশন, বাস

৪. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে বলি ও লিখি।

ক. অন্তু মামার কাছ থেকে কী সম্পর্কে জেনেছিল?
খ. কেন অন্তুর অসুখ-বিসুখ লেগেই থাকে ?
গ. সব সময় হাত পরিষ্কার না রাখলে কী হয়?
ঘ. হাত ধুয়ে পরিষ্কার রাখার সঙ্গে আর কী করতে হয়?
ঙ. হাত পরিষ্কার দেখালেও হাতের মধ্যে জীবাণু কেমন করে থাকে?
চ. কী অভ্যাস করলে অসুখ-বিসুখ অনেক কমে যায়?
ছ. অন্তু মামাকে কী কথা দিয়েছিল?

৫. গোসল করা কেন দরকার— পাঁচটি বাক্যে বলি ও লিখি।

২০২৫

৬. বিপরীত শব্দ লিখি এবং তা দিয়ে একটি করে বাক্য লিখি।

সুগন্ধ	দুর্গন্ধ	আবর্জনার দুর্গন্ধে পরিবেশ নষ্ট হয়।
হাত	পা	বাইরে থেকে এসে হাত-পা ধুয়ে নিতে হয়।
প্রিয়	....	....
বকা	....	....
হিসাব	....	....
সোজা	....	....

৭. কর্ম-অনুশীলন।

ক. কেন আমরা হাত ধুয়ে থাকি তা বলি।

খ. শ্রেণিকক্ষে হাত ধোয়ার অভিনয় করে দেখাই।

মোদের বাংলা ভাষা

সুফিয়া কামাল

মোদের দেশের সরল মানুষ
কামার কুমার জেলে চাষা
তাদের তরে সহজ হবে
মোদের বাংলা ভাষা।

বিদেশ হতে বিজাতীয়
নানান কথার ছড়াছড়ি
আর কতকাল দেশের মানুষ
থাকবে বল সহ্য করি।

যারা আছেন সামনে আজও
গুণী, জ্ঞানী, মনীষীরা
আমার দেশের সব মানুষের
এই বেদন বুঝুন তারা।

ভাষার তরে প্রাণ দিল যে
কত মায়ের কোলের ছেলে
তাদের রক্ত-পিছল পথে
এবার যেন মুক্তি মেলে।

সহজ সরল বাংলা ভাষা
সব মানুষের মিটাক আশা।

অনুশীলনী

১. জেনে নিই।

আমাদের মাতৃভাষা বাংলা সম্বন্ধে এই কবিতাটি লেখা হয়েছে। আমরা বাংলা ভাষায় কথা বলি। আমাদের বাবা-মা, দাদা-দাদি, নানা-নানি, ঠাকুরদা-ঠাকুমা সকলেই বাংলায় কথা বলেন। দেশের সব মানুষই বাংলায় কথা বলেন। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ১৯৫২ সালে ছাত্র-ছাত্রীরা মিছিল করেছিল, হরতাল করেছিল। তখন তাঁদের ওপর পুলিশ গুলি চালায়। গুলিতে ছাত্রসহ অনেকেই মারা যান। মাতৃভাষার চেয়ে প্রিয় আর কোনো ভাষা হতে পারে না। বাংলাদেশের সব মানুষের মনের কথা, আশা ও আকাঙ্ক্ষা মাতৃভাষাতেই ভালোভাবে প্রকাশ করা যায়। বাংলায় কথা বলার সময় বিদেশি ভাষা ব্যবহার না করা ভালো।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি, অর্থ বলি এবং নতুন বাক্য লিখি।

কামার কুমার সহ্য করা জ্ঞানী মনীষী রক্ত-পিছল মুক্তি বিজাতীয় বেদন মিটাক

৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে বলি ও লিখি।

ক. বাংলাদেশে 'কামার কুমার জেলে চাষা' কোন ভাষাতে কথা বলেন?

খ. এ দেশের মানুষের 'বেদন' কী?

গ. কী সহ্য করতে মানা করা হয়েছে?

ঘ. তাদের কোন মুক্তির কথা বলা হয়েছে?

ঙ. বাংলা ভাষাকে সহজ সরল ভাষা বলা হয়েছে কেন?

৪. কবিতাটি পড়ে কী বুঝলাম তা সংক্ষেপে লিখি।

৫. কবিতার প্রথম আট লাইন মুখস্থ বলি।

৬. কবিতার প্রথম আট লাইন বই না দেখে ঠিকভাবে লিখি।

৭. আমার প্রিয় মাতৃভাষা নিয়ে পাঁচটি বাক্য লিখি।

৮. ডান দিক থেকে ঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে খালি জায়গায় বসাই।

ক. লোহা দিয়ে জিনিসপত্র তৈরি করেন ....।

খ. মাটি দিয়ে জিনিসপত্র তৈরি করেন ....।

গ. যাঁর অনেক জ্ঞান আছে তিনি হলেন ....।

ঘ. রক্ত দিয়ে পিছল হয়েছে যে পথ তা হলো ....।

জ্ঞানী
কামার
রক্ত-পিছল পথ
কুমার

৯. কর্ম-অনুশীলন।

ক. বাংলা ভাষার ওপর লিখিত অন্য কোনো কবিতা বা ছড়া শিখি ও আবৃত্তি করি।

খ. শিক্ষকের সাহায্যে বাংলা ভাষা বিষয়ক স্মরণীয় বাণী পোস্টার পেপারে লিখে শ্রেণিকক্ষের দেয়ালে প্রদর্শন করি।

কবি-পরিচিতি

সুফিয়া কামাল

কবি বেগম সুফিয়া কামাল ২০শে জুন ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে বরিশাল জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কবি ও সমাজসেবী ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'সাঁঝের মায়া', 'মায়াকানন', 'ইতল বিতল', 'স্বনির্বাচিত কবিতা সংকলন' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ২০শে নভেম্বর ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

বাওয়ালিদের গল্প

আমাদের জন্মভূমি বাংলাদেশ। এর প্রায় পুরোটাই সমতলভূমি। আমাদের দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে, বঙ্গোপসাগরের তীরে সুন্দরবন। এই বনের সব গাছই বঙ্গোপসাগরের নোনা পানিতে বেঁচে আছে। এই বন হাজার রকমের পশু ও পাখিতে পূর্ণ। সুন্দরবনের কোনো কোনো জায়গায় গাছপালা এত ঘন যে, সূর্যের আলো মাটিতে পৌঁছায় না।

সুন্দরবনের তিনপাশে ছড়িয়ে আছে অনেক গ্রাম। গ্রামের মানুষ কৃষিকাজ করে। গ্রামের অনেক মানুষ বন থেকে গোলপাতা ও মধু সংগ্রহ করে। মৌমাছিরা গাছে গাছে তাদের মৌচাক বানায়। যারা মৌচাক থেকে মধু সংগ্রহ করেন, তাদের বলে মৌয়াল।

২০২৫

সুন্দরবনে বিভিন্ন ধরনের হাজার হাজার গাছ আছে। এই সব গাছ উপকূলীয় এলাকার জন্য প্রাকৃতিক ঢাল হিসেবে কাজ করে। এইজন্য ১৯৮৯ সাল থেকে সরকার সুন্দরবন থেকে কাঠ আহরণ নিষিদ্ধ করেছে। তবে সরকারের অনুমতি নিয়ে সুন্দরবন থেকে গোলপাতা সংগ্রহ করা যায়। যারা এ কাজ করেন তাদেরকে বলা হয় বাওয়ালি। বাওয়ালিদের কাজ খুবই কষ্টের। সুন্দরবনে বাঘ ও বিষধর সাপের মতো অনেক প্রাণী আছে। বাঘ মাংসাশী প্রাণী। সে অন্য প্রাণী খেয়ে বাঁচে। বাঘ মানুষকেও আক্রমণ করে। শুধু আক্রমণই করে না, খেয়েও ফেলে। তাই সুন্দরবনে বাঘই মানুষের সবচেয়ে ভয়ের বিষয়। আর পানিতে আছে মাছ, কুমির ও হাঙর। তাই মৌয়ালি ও বাওয়ালিদের বিপদ পদে পদে।

বাওয়ালি আর মৌয়ালরা সুন্দরবন থেকে অনেক দূরের গ্রামে থাকেন। রোজ রোজ বাড়ি ফিরে যাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। কোথাও না কোথাও তাদের থাকার ব্যবস্থা করতে হয়। রাতের বেলায় হিংস্র জন্তুরা তাদের আক্রমণ করতে পারে। তাই তারা নদীর মাঝখানে নৌকার মধ্যে রাত কাটান।

বাওয়ালিদের অন্য বিপদও আছে। সুন্দরবনের মধ্যে লবণাক্ত পানির নদী আর ছোট ছোট অনেক খাল রয়েছে। মানুষ লবণাক্ত পানি খেতে পারে না। সেজন্য বাওয়ালিরা তাদের সাথে পানির ছোটো ছোটো পাত্র রাখেন। তারা এই পানি খুবই সাবধানে ব্যবহার করেন। একটুও অপচয় করেন না। পানি শেষ হয়ে গেলে সহজে খাওয়ার পানি পাওয়া যায় না সুন্দরবনে। সেজন্য সুন্দরবন থেকে নানাকিছু সংগ্রহ করার জন্য যারা বনে যায়, তাদেরকে সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি, অর্থ বলি এবং বাক্য তৈরি করে লিখি।

জন্মভূমি সমতলভূমি কৃষিকাজ চাষাবাদ সংগ্রহ করা পরিশ্রম হিংস্র মাংসাশী সতর্ক লবণাক্ত

২. প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রথমে বলি ও পরে লিখি।

ক. সুন্দরবন বাংলাদেশের কোথায় অবস্থিত?

খ. সুন্দরবনের গাছপালা কোথা থেকে পানি পায়?

গ. বাওয়ালি কারা?

ঘ. বাওয়ালিদের কাজ এত বিপজ্জনক কেন?

ঙ. কীভাবে মানুষ এই বন থেকে অর্থ আয় করে, দুটো উপায় বলি।

চ. সুন্দরবনে কাজ করার সময় কোনটি বাওয়ালিদের কাছে বেশি মূল্যবান, খাবার না খাবার পানি? কেন?

ছ. বাওয়ালিরা কোথায় রাত কাটান?

জ. সরকার সুন্দরবন থেকে কাঠ আহরণ নিষিদ্ধ করেছে কেন?

ঝ. মৌয়াল ও বাওয়ালিদের কাজ বর্ণনা করি।

৩. খাতায় লিখে ছকটি পূরণ করি।

(একটি ছক বা টেবিল তৈরি করে শিক্ষার্থীরা পূরণ করবে।)

পেশার নাম	কাজ	কাজের স্থান	এই কাজের কতটা বিপদ	এই বিপদে চলার জন্য কী কী সমাধান আছে
বাওয়ালি				
মৌয়াল				

৪. নিজের জানা যেকোনো কাজ নিয়ে ছকটি পূরণ করি।

(একটি ছক বা টেবিল তৈরি করে শিক্ষার্থীরা পূরণ করবে।)

পেশার নাম	কাজ	কাজের স্থান	এই কাজের কতটা বিপদ	এই বিপদে চলার জন্য কী কী সমাধান আছে

৫. উপরের ছকের তথ্য ব্যবহার করে কাজটি সম্বন্ধে একটি অনুচ্ছেদ লিখি।

পাখির জগৎ

পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল।

কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল।

কবিতার কথাগুলো সাম্যকে ভাবিয়ে তুলল। তাই তো, ভোর হলেই পাখি ডেকে ওঠে। ঘুম ভেঙে যায়। পাখিরা যেন ভোরের দূত। চড়ুই, শালিক এরকম দুয়েকটা পাখি সাম্য দেখেছে। কিন্তু আরও যে নানা ধরনের পাখি আছে, সে সব পাখির কথা জানতে ইচ্ছে করে তার। মাকে সে জিজ্ঞেস করে পাখিদের কথা।

আচ্ছা মা, ভোর না হতেই পাখিরা কিচিরমিচির করা শুরু করে দেয়। পাখিরা কি রাতে ঘুমায় না? মা বলেন, তা হবে কেন। পাখিরাও ঘুমায়। মা বলেন, পাখির দেশ, নদীর দেশ বাংলাদেশ। পাখিরা প্রকৃতির শোভা। গাছে গাছে ঝোপে ঝাড়ে নদীতীরে তাদের বিচরণ। কখনো তারা দল বেঁধে আকাশে উড়ে বেড়ায়। কখনো পাতার ফাঁকে চুপ করে বসে থাকে। কখনো খাবারের জন্য পোকামাকড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

মা আরও বললেন, দোয়েল আমাদের জাতীয় পাখি। এদের গায়ের রং সাদা-কালো। এরা থাকে লোকালয়ে আর অগভীর জঙ্গালে। গাছের উঁচু ডালে মাঝে মাঝে মধুর সুরে গান গায়। ছোটো ডাল, খড়কুটো ও শিকড়-বাকড় দিয়ে বাসা বানায়। নানা ফুলের মধু আর কীটপতঙ্গ এদের প্রধান খাদ্য।

ছোট্ট পাখি চড়ুই। চড়ুই আমাদের ঘরেরই কেউ। লোকালয় এদের প্রিয় জায়গা। বাসাবাড়ির ঘুলঘুলিতে খড়, টুকরো কাপড়, শুকনো ঘাস দিয়ে এরা বাসা তৈরি করে। মাথা ছাই রঙের। পিঠে বাদামি পালক। তার উপরে কালো ছোট দাগ। ডানার উপরে সাদা অথবা লালচে রেখা। এরা কীটপতঙ্গ খেয়ে ফসলের শত্রু নাশ করে। শস্যদানা এদের প্রিয় খাদ্য।

দোয়েল　　　　চড়ুই

ছোট্ট আরেক পাখি টুনটুনি। পালকের রং জলপাই সবুজ। মাথায় লালচে রঙের ছোপ। লম্বা ঠোঁটের রং কালচে খয়েরি। পায়ের রং হলুদাভ। লেজ নাড়িয়ে টুই টুই শব্দ করে উড়ে বেড়ায়। এরা মানুষের কাছাকাছি থাকতে ভালোবাসে। চমৎকার বাসা বানায়। পোকামাকড় খেয়ে পরিবেশ সুন্দর রাখে। ফুলের মধুই টুনটুনির সবচেয়ে প্রিয়।

চড়ুইয়ের মতো চঞ্চল স্বভাবের আরেকটি পাখি হলো বুলবুলি। বুলবুলির মাথা ও গলা কালো। মাথার উপর রাজকীয় কালো ঝুঁটি। এর তলপেট সাদা। তলপেটের শেষে লাল ছোপ। এরা খুব দ্রুত উড়তে পারে।

পানির সঙ্গে যার সখ্য, সেই পাখিটির নাম পানকৌড়ি। পুকুর, খাল ও বিল এদের বিচরণক্ষেত্র। কুচকুচে কালো এই পাখি ডুব দিয়ে তিন মিটার পর্যন্ত সাঁতরাতে পারে। এদের পায়ের পাতা হাঁসের মতো। ঠোঁট তীক্ষ্ণ আর বাঁকানো। এরা জলজ কীটপতঙ্গ খেতে ভালোবাসে।

২০২৫

বাঁশপাতি

শালিক

বাংলাদেশে আরও অনেক পাখি আছে। এই পাখিগুলো হলো খঞ্জনা, ডাহুক, কোকিল, বাঁশপাতি, শ্যামা, ধনেশ, পানডুবি, ফিঙে, টিয়া, বাবুই ইত্যাদি। মা বলেন, পাখিরা মানুষের বন্ধু। এরা অনেক উপকারী। কিছু কিছু পাখি পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখে।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

বিচরণ চমৎকার পরিবেশ ঝুঁটি নাশ দূত লোকালয় সখ্য

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

উপকারী	লোকালয়ে	পরিবেশ	কীটপতঙ্গ

ক. নানা ফুলের মধু ও .... পাখিদের প্রিয় খাবার।

খ. চড়ুই পাখি .... থাকতেই বেশি পছন্দ করে।

গ. আমাদের .... রক্ষার প্রতি সচেতন হওয়া উচিত।

ঘ. পাখিরা মানুষের বন্ধু, এরা অনেক ....।

২০২৫

৩. যুক্তবর্ণগুলো দেখি ও যুক্তবর্ণ দিয়ে গঠিত শব্দগুলো পড়ি ও লিখি।

আনন্দ	ন্দ	ন	দ	মন্দ, ছন্দ
জিজ্ঞেস	জ্ঞ	জ	ঞ	আজ্ঞা, বিজ্ঞ
জঙ্গল	ঙ্গ	ঙ	গ	মঙ্গল, রঙ্গ
লম্বা	ম্ব	ম	ব	সম্বল, কম্বল

৪. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিই।

ক. চড়ুই পাখির প্রিয় জায়গা–

১. বন ২. লোকালয়

৩. স্কুলঘর ৪. আস্তাবল

খ. পানকৌড়ি খেতে ভালোবাসে –

১. মাছ ২. মাংস

৩. কীটপতঙ্গ ৪. গাছের পাতা

গ. পাখিরা পরিবেশকে –

১. নষ্ট করে ২. দূষণ করে

৩. সবুজ রাখে ৪. সুন্দর রাখে

৫. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. পাখিদের ভোরের দূত বলা হয়েছে কেন?
খ. জাতীয় পাখি দোয়েলের খাদ্য কী?
গ. কোন পাখি আমাদের ঘরেরই কেউ? কেন?
ঘ. কোন পাখি পরিবেশ সুন্দর রাখতে সাহায্য করে? কীভাবে?
ঙ. বুলবুলি পাখি দেখতে কেমন?

৬. বাক্য রচনা করি।

জগৎ পরিবেশ দূত ক্লাস শস্যদানা স্বভাব

৭. বাম পাশের বৈশিষ্ট্যের সাথে ডান পাশের পাখির ছবি মিলাই।

খুব দ্রুত উড়তে পারে

শিকড়বাকড় দিয়ে বাসা বানায়

লেজ নাড়িয়ে টুই টুই শব্দ করে উড়ে বেড়ায়

লোকালয় এদের প্রিয় জায়গা

পানিতে বেশি সময় থাকে

৮. ব্যবহার শিখি ।

টি, টা, খানা, খানি, এটি, ওটি, এগুলো, ওগুলো

টি – পাখিটি দেখতে কী সুন্দর!

টা – শেলফের বইটা কার?

খানা – বইখানা দাও।

খানি – মুখখানি তার ভারি মিষ্টি।

এটি – এটি আমার বই।

ওটি – ওটি কার বই?

এগুলো – এগুলো পাখির ছবি ।

ওগুলো – ওগুলো ধরো না।

৯. কর্ম অনুশীলন ।

আমার দেখা যেকোনো একটি পাখির কথা বর্ণনা করি।

কাজলা দিদি

যতীন্দ্রমোহন বাগচী

বাঁশবাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই
মাগো, আমার শোলক-বলা কাজলা দিদি কই?
পুকুর ধারে, নেবুর তলে থোকায় থোকায় জোনাই জ্বলে,
ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না, একলা জেগে রই;
মাগো, আমার কোলের কাছে কাজলা দিদি কই?

২০২৫

সেদিন হতে দিদিকে আর কেনই-বা না ডাকো,
দিদির কথায় আঁচল দিয়ে মুখটি কেন ঢাকো?

খাবার খেতে আমি যখন দিদি বলে ডাকি, তখন
ও-ঘর থেকে কেন মা আর দিদি আসে নাকো,
আমি ডাকি, – তুমি কেন চুপটি করে থাকো?
বল মা, দিদি কোথায় গেছে, আসবে আবার কবে?
কাল যে আমার নতুন ঘরে পুতুল-বিয়ে হবে!
দিদির মতন ফাঁকি দিয়ে আমিও যদি লুকোই গিয়ে –
তুমি তখন একলা ঘরে কেমন করে রবে?
আমিও নাই দিদিও নাই কেমন মজা হবে!

ভুঁইচাঁপাতে ভরে গেছে শিউলি গাছের তল,
মাড়াস নে মা পুকুর থেকে আনবি যখন জল;
ডালিম গাছের ডালের ফাঁকে বুলবুলিটি লুকিয়ে থাকে,
দিস না তারে উড়িয়ে মা গো, ছিঁড়তে গিয়ে ফল;
দিদি এসে শুনবে যখন, বলবে কী মা বল!

বাঁশবাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই
এমন সময়, মাগো, আমার কাজলা দিদি কই?
বেড়ার ধারে, পুকুর পাড়ে ঝিঁঝি ডাকে ঝোঁপে-ঝাড়ে;
নেবুর গন্ধে ঘুম আসে না– তাইতো জেগে রই;
রাত হলো যে, মাগো, আমার কাজলা দিদি কই?

অনুশীলনী

১. জেনে নিই।

ছোট্ট বোনটির সারাক্ষণের সাথি ছিল কাজলা দিদি। দিদি চিরদিনের জন্য তাদের ছেড়ে চলে গেছে, তা সে জানে না, বোঝে না। প্রতি মুহূর্তেই সে তার প্রিয় কাজলা দিদির জন্য অপেক্ষায় থাকে। সে কোথায় গেছে, কেন আসে না তা জানতে চায় মায়ের কাছে। মা উত্তর দিতে পারেন না। মুখ লুকিয়ে শুধু কাঁদেন।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি, অর্থ বলি এবং নতুন বাক্য লিখি।

শোলক   জোনাই   দিদি   নেবু   ভুঁইচাঁপা   মাড়াস নে

৩. বিপরীত শব্দগুলো জেনে নিই।

দিন – রাত

ঘুম – জাগরণ

ঢাকা – খোলা

নতুন – পুরানো

জ্বলা – নেভা

৪. ডান দিক থেকে ঠিক উত্তরটি বেছে নিই ও খাতায় লিখি।

প্রশ্ন	উত্তর
ক. কোথায় জোনাকি জ্বলে?	নেবুর তলে / বাঁশবাগানে/ শিউলিতলে / তাল তলায়
খ. বুলবুলি কোথায় লুকিয়ে থাকে?	শিউলির ডালে / ভুঁইচাঁপার ডালে/ আমের ডালে / ডালিমের ডালে
গ. কে শোলক বলতেন?	মা / দিদি / দাদু / বাবা
ঘ. ঝিঁঝিঁ কোথায় ডাকে?	ঝোঁপে–ঝাড়ে / গাছের ডালে/ আঁধার রাতে / ঘরের মাঝে
ঙ. ঘুম আসে না কেন?	নেবুর গন্ধে / ঝিঁঝিঁর ডাকে/ চাঁদের আলোতে / ফুলের গন্ধে

৫. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. কাজলা দিদি কোথায় গেছে?

খ. কখন কাজলা দিদির কথা বেশি মনে পড়ে?

গ. কাজলা দিদির কথা উঠলে মা আঁচল দিয়ে মুখ ঢাকেন কেন?

ঘ. পুতুলের বিয়ের সময় দিদির কথা মনে পড়ে কেন?

ঙ. আমিও নাই, দিদিও নাই, কেমন মজা হবে– এ কথা বলে কী বোঝানো হয়েছে?

চ. খুকি মাকে কেন শিউলি ফুলের গাছের নিচে সাবধানে যেতে বলেছেন?

ছ. ডালিম গাছের ফল ছিঁড়তে বারণ করেছে কেন?

৬. নিচের শব্দগুলো ঠিকভাবে সাজাই (যেমন– বাঁশবাগান)।

পুতুল	তলে
থোকায়	ধারে
পুকুর	বিয়ে
নেবুর	ঘরে
শোলক	থোকায়
কাজলা	বাগান
বাঁশ	বলা
নতুন	দিদি

৭. কবিতাটি বিরামচিহ্ন দেখে ও ভাব বজায় রেখে পড়ি।

কবি-পরিচিতি

যতীন্দ্রমোহন বাগচী

১৮৭৮ সালের ২৭শে নভেম্বর যতীন্দ্রমোহন বাগচী নদীয়া জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কবিতা রচনা ছাড়াও 'মানসী' ও 'পূর্বাচল' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। পল্লিপ্রীতি তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'লেখা', 'কেয়া', 'বন্ধুর দান' ইত্যাদি। 'কাজলা দিদি' কবিতাটি 'কাব্যমালঞ্চ' কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। ১৯৪৮ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি তাঁর মৃত্যু হয়।

পাঠান মুলুকে

সৈয়দ মুজতবা আলী

সর্দারজি চুল বাঁধতে, দাড়ি সাজাতে আর পাগড়ি পাকাতে আরম্ভ করলেন। তখনই বুঝতে পারলুম যে পেশাওয়ার পৌঁছতে আর মাত্র ঘণ্টাখানেক বাকি। গরমে, ধুলোয়, কয়লার গুঁড়োয়, কাবাব-রুটিতে আর স্নানাভাবে আমার গায়ে একরত্তি শক্তি নেই। বিছানা গুটিয়ে হোল্ডল বন্ধ করতেও পারছিলাম না। কিন্তু পাঠানের সঙ্গে ভ্রমণ করাতে সুখ আছে। আমাদের কাছে যেটা কঠিন বলে বোধ হয় পাঠান সেটা গায়ে পড়ে করে দেয়।

ইতোমধ্যে গল্পে গল্পে জেনে গেছি পাঠান-মুলুকের প্রবাদ। দিনের বেলা পেশাওয়ার ইংরেজের, রাত্রে পাঠানের। গাড়ি পেশাওয়ার পৌঁছবে রাত নয়টায়। তখন যে কার রাজত্বে পৌঁছব তাই নিয়ে মনে মনে নানা ভাবনা ভাবছি, এমন সময় দেখি গাড়ি এসে পেশাওয়ারেই দাঁড়াল। বাইরে ঠা-ঠা আলো, নয়টা বাজল কী করে, আর পেশাওয়ারে পৌঁছুলাম বা কী করে? এখন চেয়ে দেখি সত্যি নয়টা বেজেছে।

২০২৫

প্ল্যাটফরমে বেশি ভিড় নেই। জিনিসপত্র নামাবার ফাঁকে লক্ষ করলুম ছয় ফুটি পাঠানের চেয়েও একমাথা উঁচু এক ভদ্রলোক আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। তিনি এসে উত্তম উর্দুতে আমাকে বললেন, তাঁর নাম শেখ আহমদ আলী। আমি নিজের নাম বলে একহাত এগিয়ে দিলাম। তিনি তাঁর দুহাতে সেটি লুফে নিয়ে দিলেন এক চাপ পরম উৎসাহে, গরম সংবর্ধনায়! হঠাৎ আমাকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে খাস পাঠানি কায়দায় আলিঙ্গন করতে আরম্ভ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি উর্দু পশ্‌তুতে মিলিয়ে অনেক কথা বলছিলেন। তার অনুবাদ –"ভালো আছেন তো, মঙ্গল তো, সব ঠিক তো, বেজায় ক্লান্ত হয়ে পড়েননি তো?" আমি 'জি হাঁ, জি না' করেই যাচ্ছি। আর ভাবছি গাড়িতে পাঠানদের কাছ থেকে তাদের আদবকায়দা কিছুটা শিখে নিলে ভালো করতাম। খানিকটা কোলে-পিঠে, খানিকটা টেনে-হিঁচড়ে তিনি আমাকে স্টেশনের বাইরে এনে একটা টাঙ্গায় বসালেন। আমি তখন শুধু ভাবছি ভদ্রলোক আমাকে চেনেন না জানেন না। আমি বাঙালি তিনি পাঠান। তবে যে এত সংবর্ধনা করছেন তার মানে কী? এর কতটা আন্তরিক, আর কতটা লৌকিকতা?

আজ বলতে পারি পাঠানের অভ্যর্থনা সম্পূর্ণ নির্জলা আন্তরিক। অতিথিকে বাড়িতে ডেকে নেওয়ার মতো আনন্দ পাঠান অন্য কোনো জিনিসে পায় না। আর সে অতিথি যদি বিদেশি হয় তাহলে তো কথাই নেই।

টাঙ্গা তো চলছে পাঠানি কায়দায়। আমাদের দেশে সাধারণত লোকজন রাস্তা সাফ করে দেয় – গাড়ি সোজা চলে। পাঠানমুলুকে লোকজন যার যে রকম খুশি চলে। গাড়ি এঁকে-বেঁকে রাস্তা করে নেয়। ঘণ্টা বাজানো, চিৎকার বৃথা। খাস পাঠান কখনো কারো জন্যে রাস্তা ছেড়ে দেয় না। সে স্বাধীন, রাস্তা ছেড়ে দিতে হলে তার স্বাধীনতা রইল কোথায়? কিন্তু ওই স্বাধীনতার দাম দিতেও সে কসুর করে না। ধরা যাক, ঘোড়ার নালের চাট লেগে তার পায়ের এক খাবলা মাংস উড়ে গেল। এতে সে রেগে গালাগালি, মারামারি বা পুলিশে ডাকাডাকি করে না। পরম শ্রদ্ধায় ও বিরক্তি সহকারে ঘাড় বাঁকিয়ে শুধু জিজ্ঞাসা করে, দেখতে পাস না? গাড়োয়ানও স্বাধীন পাঠান – ততোধিক অবজ্ঞা প্রকাশ করে বলে, 'তোর চোখ নেই?' ব্যস্। যে যার পথে চলল।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

স্নানাভাবে একরত্তি হোল্ডল ঠাঁ-ঠাঁ আলো আলিঙ্গান করা পশ্‌তু অভ্যর্থনা নির্জলা বৃথা খাস ঘোড়ার নালের চাট অবজ্ঞা টাঙ্গা কসুর প্ল্যাটফরম

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

বৃথা	আলিঙ্গান	অভ্যর্থনা	একরত্তি	ঠাঁ-ঠাঁ আলো

ক. আমার চোখে .... ঘুম নেই।

খ. এত .... চোখ মেলে তাকানো যায় না।

গ. ঈদের সময় আমরা সবাই .... করে থাকি।

ঘ. তাদের .... অনেক ভালো ছিল।

ঙ. ....সময় নষ্ট করা ঠিক নয়।

৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. সর্দারজিকে চেনা যায় কী দেখে?

খ. দিনের বেলায় ও রাত্রে পেশাওয়ার শহরে কী হয়?

গ. পাঠানদের অভ্যর্থনা কেমন হয়ে থাকে এবং কেন?

ঘ. পাঠানেরা কীভাবে টাঙ্গা চালায়?

৪. ক্রিয়াপদের বিভিন্ন রূপ রয়েছে। যেমন– মূল ক্রিয়াপদ – যাওয়া। এই ক্রিয়াপদটি থেকে অনেক শব্দ হতে পারে। যেমন–

যাই – আমি বাড়ি যাই।

যাব – আমি বিকেলে খেলা দেখতে যাব।

গিয়েছি – আমি ওখানে গতকালও গিয়েছি।

যেতাম – ছোটবেলায় আমি প্রায়ই মামাবাড়ি যেতাম।

এখন নিচের ক্রিয়াপদগুলো দিয়ে একইরকম ভাবে শব্দ ও বাক্য লিখি।

আসা, খাওয়া, করা

৫. বাক্য রচনা করি ।

ভ্রমণ পেশাওয়ার ঠা-ঠা আলো সংবর্ধনা ডাকাডাকি অবজ্ঞা

৬. বিপরীত শব্দ লিখি এবং তা দিয়ে একটি করে বাক্য লিখি।

আরম্ভ	শেষ	আজ আমার পরীক্ষা শেষ হলো ।
গরম	ঠান্ডা	শীতকালে প্রচুর ঠান্ডা লাগে।
কঠিন	....	....
ভিতর	....	....
দিন	....	....
দাঁড়ানো	....	....
আলো	....	....
উঁচু	....	....

৭. কর্ম-অনুশীলন।

নিজে বেড়িয়ে এসেছি এরকম একটা জায়গা সম্পর্কে বলি।

লেখক-পরিচিতি

সৈয়দ মুজতবা আলী

১৯০৪ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর সৈয়দ মুজতবা আলী আসামের কাছাড় জেলার করিমগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিশ্বভারতী থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। পরে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। ১৯২৭ সালে তিনি আফগানিস্তানের শিক্ষা বিভাগের অধীনে কাবুল কৃষিবিজ্ঞান কলেজে ইংরেজি ও জার্মান ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কাবুল প্রবাসের বিচিত্র অভিজ্ঞতা বর্ণিত হয়েছে তাঁর 'দেশে বিদেশে' গ্রন্থে। ১৯৭৪ সালে ১১ই ফেব্রুয়ারি তিনি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

২০২৫

মা

কাজী নজরুল ইসলাম

যেখানেতে দেখি যাহা
মা-এর মতন আহা
একটি কথায় এত সুধা মেশা নাই,
মায়ের মতন এত
আদর সোহাগ সে তো
আর কোনোখানে কেহ পাইবে না ভাই।

হেরিলে মায়ের মুখ,
দূরে যায় সব দুখ,
মায়ের কোলেতে শুয়ে জুড়ায় পরান,
মায়ের শীতল কোলে
সকল যাতনা ভোলে
কত না সোহাগে মাতা বুকটি ভরান।

যখন জনম নিনু
কত অসহায় ছিনু,
কাঁদা ছাড়া নাহি জানিতাম কোনো কিছু,
ওঠা বসা দূরে থাক–
মুখে নাহি ছিল বাক,
চাহনি ফিরিত শুধু মা'র পিছু পিছু!

পাঠশালা হতে যবে
ঘরে ফিরি যাব সবে,
কত না আদরে কোলে তুলি নেবে মাতা,
খাবার ধরিয়া মুখে
শুধাবেন কত সুখে
‘কত আজ লেখা হলো, পড়া কত পাতা?’

পড়া লেখা ভালো হলে
দেখেছ সে কত ছলে
ঘরে ঘরে মা আমার কত নাম করে!
বলে, ‘মোর খোকামণি।
হীরা-মানিকের খনি,
এমনটি নাই কারো!’ শুনে বুক ভরে!

দিবানিশি ভাবনা
কিসে ক্লেশ পাব না,
কিসে সে মানুষ হব, বড়ো হব কিসে;
বুক ভরে ওঠে মা’র
ছেলেরি গরবে তাঁর
সব দুখ সুখ হয় মায়ের আশিসে।

(অংশবিশেষ)

অনুশীলনী

১. জেনে নিই।

আমাদের সবার জীবনে ‘মা’ কথাটি একটি মধুমাখা নাম। মায়ের মমতা আমাদের চলার পথের পাথেয়। শৈশবে মা আমাদের গভীর মমতায় লালন করেন। ভালোভাবে লেখাপড়া করলে, জীবনে সফল হলে মা খুশি হন। অন্যদিকে মায়ের আশিস পেলে সন্তানের দুঃখ ঘুচে যায়।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি, অর্থ বলি এবং নতুন বাক্য লিখি।

মতন সুধা হেরিলে পরান যাতনা নিনু ছিনু বাক শুধাবেন সোহাগ

৩. কবিতার চরণ দেওয়া আছে, পরবর্তী চরণ লিখি।

হেরিলে মায়ের মুখ,

....

মায়ের কোলেতে শুয়ে জুড়ায় পরান,

....

সকল যাতনা ভোলে

....

৪. কবিতাটি আবৃত্তি করি।

৫. কবিতার প্রথম বারোটি চরণ মুখস্থ লিখি।

৬. কবিতাটিতে কবি কী বলেছেন তা সংক্ষেপে বলি ও লিখি।

৭. আমার 'মা' সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লিখি।

কবি-পরিচিতি

কাজী নজরুল ইসলাম

১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৫শে মে কাজী নজরুল ইসলাম বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একাধারে কবি, গল্পকার, প্রাবন্ধিক, সাংবাদিক, সুরস্রষ্টা, গীতিকার ও সংগীতশিল্পী। তিনি 'নবযুগ' ও 'ধূমকেতু' সহ আরও অনেক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। 'মা' কবিতাটি তাঁর 'ঝিঙেফুল' কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম। ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৯শে আগস্ট ঢাকায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

২০২৫

ঘুরে আসি সোনারগাঁও
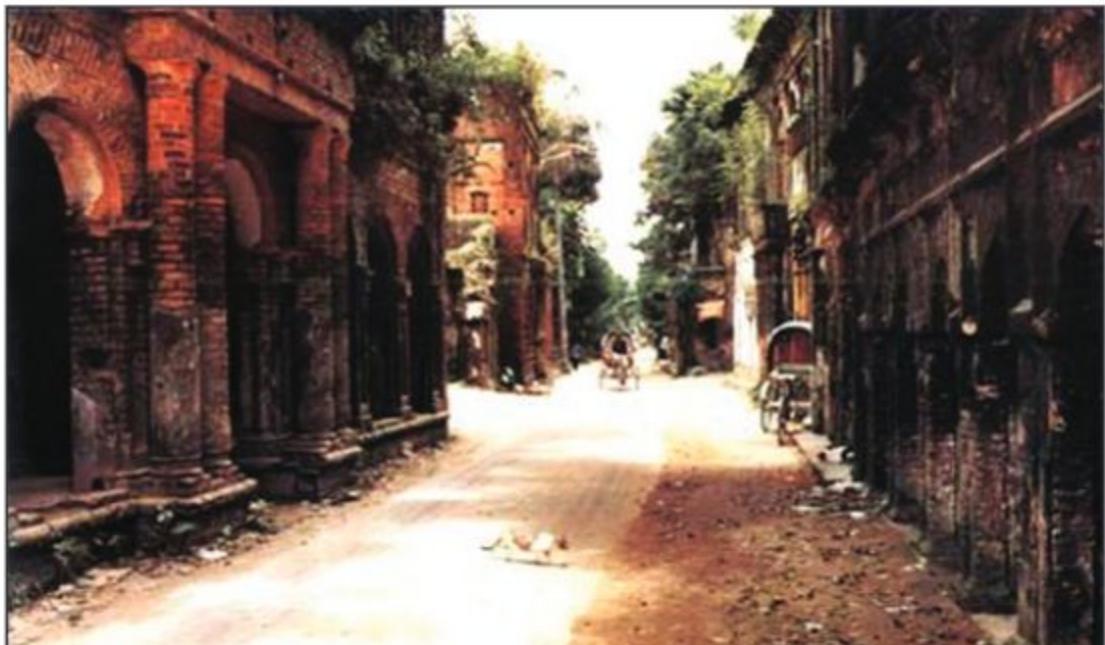
পানাম নগর, সোনারগাঁও

জানুয়ারির মাঝামাঝি। শীতের সকাল। কুয়াশার আবরণ ভেদ করে সূর্য কেবল উঁকি দিচ্ছে আকাশে। এর মধ্যে সবাই পৌঁছে গেছে স্কুলে। সাবিহা, নমিতা, কবির, সুবীর সবাই। হাসান স্যার তো আগেই এসে গেছেন।

সবাই যাবে শিক্ষা সফরে। ঐতিহাসিক সোনারগাঁও যাবে তারা। কী আনন্দ, কী উল্লাস সবার মনে!

সাবিহা ভাবছিল সোনারগাঁও আসলে দেখতে কেমন? এটা কি সোনা দিয়ে মোড়া কোনো গ্রাম? হঠাৎ তার চিন্তায় ছেদ পড়ল। হাসান স্যার সবাইকে বাসে ওঠার জন্য তাড়া দিলেন। সবাই সুশৃঙ্খল হয়ে বাসে বসল। হাসান স্যার এবার ঢাকার একটি ম্যাপ ঝুলিয়ে দেখালেন, বললেন–"এই দেখ, সোনারগাঁও। ঢাকা থেকে সোনারগাঁয়ের দূরত্ব ২৭ কিলোমিটার। এটা নারায়ণগঞ্জ জেলায়। ঢাকার দক্ষিণ-পূর্বে এই প্রাচীন নগরী সোনারগাঁওয়ের অবস্থান।"

সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনছিল হাসান স্যারের কথা। তিনি জানালেন, "আমরা গুলিস্তান-যাত্রাবাড়ি ফেলে এসেছি। এবার আমাদের বাস চলছে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক পথে। কাচপুর ব্রিজ পার হয়ে একটু গেলেই সোনারগাঁও।"

দেখতে দেখতে বাস এসে পৌঁছাল সোনারগাঁও। সোনারগাঁওয়ের মাটিতে পা দিয়েই সাবিহার মন খুশিতে ভরে উঠল। চারদিকে সবুজ গাছপালা আর শীতের সকালের মিষ্টি রোদ্দুর। প্রথমেই তাদের চোখে পড়ল একগম্বুজ বিশিষ্ট একটা প্রাচীন মসজিদ। স্যার বললেন, এটা হচ্ছে গোয়ালদি মসজিদ। মোঘল স্থাপত্যশৈলীর অপূর্ব নিদর্শন রয়েছে এ মসজিদে। তবে এটা তৈরি হয়েছিল মোঘলরা বঙ্গাদেশে আসারও আগে।

হাসান স্যার আরও জানালেন, প্রাচীনকালের সমৃদ্ধ নগর সুবর্ণগ্রাম। পরে এর নাম হয় সোনারগাঁও। ঢাকার আগে সোনারগাঁও ছিল দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার রাজধানী। ঈশা খাঁ ছিলেন এই অঞ্চলের শাসক।

সোনারগাঁওয়ের সবচেয়ে সমৃদ্ধ এলাকা পানাম নগর। এ যেন নগরের মধ্যে আরেক নগর! সাবিহার ভাবতে আর বেড়াতে বেশ ভালোই লাগছে।

এখানে একটা মাত্র রাস্তা। তার দুই পাশে সারি সারি প্রাচীন দালান। দালানগুলো খুব উঁচু নয়। সবই দোতলা। প্রায় একশো বছরেরও আগের তৈরি। এখানেই ধনী ব্যবসায়ীরা বসবাস করতেন। সোনারগাঁও তখন ছিল মসলিন কাপড় তৈরির প্রসিদ্ধ স্থান। সোনারগাঁওয়ে তৈরি মসলিনের বিশ্বজোড়া খ্যাতি ও কদর ছিল। পরে সুতি কাপড়ের প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে এটি। কিন্তু এদেশে ইংরেজরা আসার পর দেশি কাপড়ের কদর কমে যায়।

লোকশিল্প জাদুঘর, সোনারগাঁও

তখন বিলিতি কাপড় আসা শুরু করে এদেশে। বন্ধ হয়ে যায় এখানকার ব্যবসা-বাণিজ্য। এ শহরের পুরোনো দালানগুলো বাংলার অভূতপূর্ব স্থাপত্যশৈলীর সাক্ষী। আমাদের সংস্কৃতির নিদর্শন হিসেবে যেন সগর্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। সবশেষে আমাদের শেষ গন্তব্য সোনারগাঁও লোকশিল্প জাদুঘর দেখার পালা।

একটি দেশের শিল্প-সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্যের যাবতীয় নিদর্শন জাদুঘরেই সংরক্ষিত থাকে। সোনারগাঁওয়ের জাদুঘরে ঢুকতে ঢুকতে সবুজের স্নিগ্ধ পরশে সাবিহার মনটা ভরে গেল। কী চমৎকার একটা লেক! শান্ত পুকুর আর গাছগাছালিতে ভরা চারপাশ।

প্রথমেই সবাই ঢুকে পড়ল লোকশিল্প জাদুঘরে। জাদুঘরটা সাধারণ জাদুঘর নয়, লোকশিল্পের জাদুঘর। আমাদের গ্রামীণ মানুষের তৈরি জিনিসপত্রকে বলে লোকশিল্প। হাসান স্যারই কথাটা বুঝিয়ে দিলেন। যে বাড়িতে জাদুঘরটা করা হয়েছে তার আদি নাম বড় সর্দারবাড়ি। দারুণ কারুকাজ করা এর প্রবেশপথ। কত্তো জিনিস যে আছে দেখবার, শিখবার! কাঠের তৈরি জিনিস, মুখোশ, মৃৎপাত্র, মাটির পুতুল, বাঁশ-লোহা-কাঁসার তৈরি নানা জিনিস, অলংকার ইত্যাদি দেখে সবাই বিস্মিত। কী সুন্দর জামদানি শাড়ি আর কী বাহার ওই নকশিকাঁথার!

সোনারগাঁ লোকশিল্প জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা শিল্পী জয়নুল আবেদিন। তাঁর সংগ্রহশালায় গিয়ে আরও মুগ্ধ সবাই। তিনি ছিলেন অনেক বড় শিল্পী।

শখের হাঁড়ি

সূর্য তখন পশ্চিমে ঢলে পড়েছে। এবার ঐতিহাসিক সোনারগাঁও থেকে ওদের ফেরার পালা। বাসের জানালা দিয়ে অস্তগামী সূর্যের ছবি দেখতে দেখতে ওরা ফিরে এল ঢাকা। এ স্মৃতি সবার মনে গাঁথা থাকবে অনেক দিন।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

ঐতিহাসিক গম্বুজ বঙ্গাদেশ স্থাপত্য নিদর্শন শাসনকর্তা অঞ্চল সমৃদ্ধ প্রসিদ্ধ মসলিন বিলিতি অভূতপূর্ব অস্তগামী স্মৃতি লোকশিল্প বিস্মিত বাহার ম্যাপ কদর খ্যাত

২. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. সোনারগাঁও কোথায় অবস্থিত?

খ. গোয়ালদি মসজিদ কী জন্য বিখ্যাত?

গ. পানাম নগর কী জন্য প্রসিদ্ধ?

ঘ. লোকশিল্প কাকে বলে?

ঙ. লোকশিল্প জাদুঘর কেন দরকার?

চ. জাদুঘর বলতে কী বুঝি?

ছ. সোনারগাঁও লোকশিল্প জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা কে?

৩. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিই।

ক. ঘুরে আসি সোনারগাঁও গল্পে শিক্ষা সফরে সবাই কোথায় যাচ্ছিল –

১. যাত্রাবাড়ি ২. সোনারগাঁও

৩. পাহাড়পুর ৪. চট্টগ্রাম

খ. লোকশিল্প জাদুঘরের প্রবেশ পথটি কেমন –

১. দারুণ কারুকাজ করা ২. সাধারণ

৩. অনেক পুরোনো ৪. নতুন

গ. মসলিন কাপড়ের জন্য প্রসিদ্ধ স্থান –

১. নারায়ণগঞ্জ　　২. সোনারগাঁও

৩. গুলিস্তান　　৪. নওগাঁ

ঘ. ঢাকার আগে সোনারগাঁও ছিল –

১. পূর্ব বাংলার রাজধানী　　২. দক্ষিণ বাংলার রাজধানী

৩. দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার রাজধানী　　৪. উত্তর বাংলার রাজধানী

ঙ. দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন –

১. ঈশা খাঁ　　২. তিতুমীর

৩. আলীবর্দি খাঁ　　৪. নবাব আহসানউল্লাহ

চ. ঢাকা থেকে সোনারগাঁওয়ের দূরত্ব –

১. ২৭ কিমি　　২. ২২ কিমি

৩. ২৫ কিমি　　৪. ২৮ কিমি

৪. বাম পাশের শব্দাংশের সাথে ডান পাশের ঠিক শব্দাংশ মিলিয়ে পড়ি ও লিখি।

সমৃদ্ধ এলাকা	গোয়ালদি
প্রাচীন মসজিদ	লোকশিল্পের প্রতিষ্ঠাতা
মসলিন কাপড়	সোনারগাঁও-এর শাসনকর্তা
জয়নুল আবেদিন	জগৎ জোড়া খ্যাত
ঈশা খাঁ ছিলেন	পানাম নগর

৫. আমার নিজের গ্রাম বা শহরের কথা সংক্ষেপে বর্ণনা করি।

২০১৫

৬. একই অর্থ বোঝায় এরকম কয়েকটি শব্দ শিখি।

ফুল – পুষপ, কুসুম, মঞ্জরী, প্রসূন, পুষ্পক

পানি – জল, বারি, সলিল, নীর, অম্বু

পৃথিবী – জগৎ, ধরণী, ধরিত্রি, ভুবন, বসুন্ধরা

নদী – তটিনী, গাং, প্রবাহিণী, কল্লোলিনী

পতাকা – কেতন, ঝাণ্ডা, নিশান, বৈজয়ন্তী, ধ্বজা

৭. বিপরীত শব্দ লিখি।

সকাল বিকাল

যাওয়া ....

আনন্দ ....

মিষ্টি ....

রোদ ....

প্রথম ....

৮. কর্ম অনুশীলন।

ক. মনে করো, একজন বিদেশির সাথে তোমার পরিচয় হয়েছে। তিনি আগে কখনো বাংলাদেশে আসেননি। তিনি বাংলাদেশের আচার, অনুষ্ঠান, সংস্কৃতি ইত্যাদি সম্পর্কে জানার জন্য কোথায় যাবেন, তা তোমার কাছে জানতে চাইলেন। সেক্ষেত্রে তুমি তাকে কোথায় যাওয়ার পরামর্শ দেবে এবং কেন?

খ. নিচের যেকোনো একটি বিষয় নিয়ে ৮টি বাক্য লিখি ।

সোনারগাঁও

জাদুঘর

স্মৃতিসৌধ

শহিদ মিনার

বীরপুরুষ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
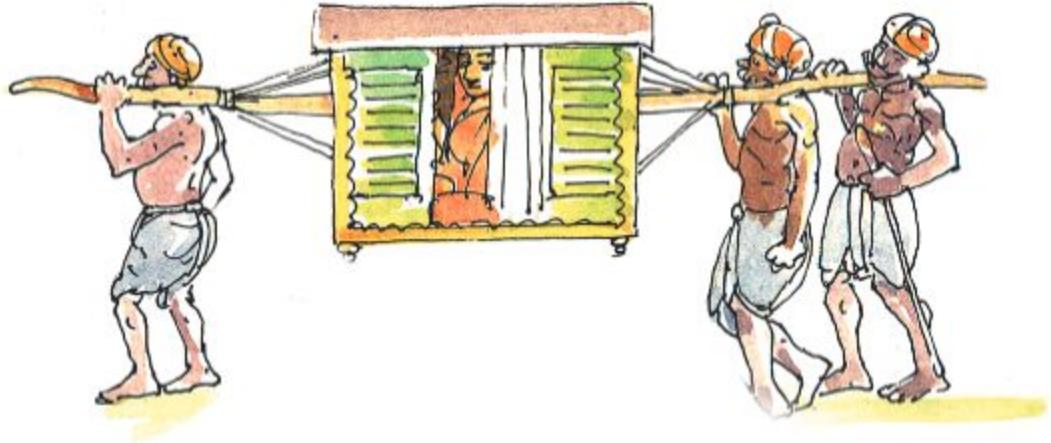
মনে করো, যেন বিদেশ ঘুরে
মাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে।
তুমি যাচ্ছ পালকিতে মা চড়ে
দরজা দুটো একটুকু ফাঁক করে,
আমি যাচ্ছি রাঙা ঘোড়ার 'পরে
টগ্‌বগিয়ে তোমার পাশে পাশে।
রাস্তা থেকে ঘোড়ার খুরে খুরে
রাঙা ধুলোয় মেঘ উড়িয়ে আসে।

সন্ধে হলো, সূর্য নামে পাটে,
এলেম যেন জোড়াদিঘির মাঠে।
ধু ধু করে যে দিক-পানে চাই,
কোনোখানে জনমানব নাই,
তুমি যেন আপন মনে তাই
ভয় পেয়েছ—ভাবছ, 'এলেম কোথা!'
আমি বলছি, 'ভয় করো না মা গো,
ওই দেখা যায় মরা নদীর সোঁতা।'

২০২৫

আমরা কোথায় যাচ্ছি কে তা জানে–
অন্ধকারে দেখা যায় না ভালো।
তুমি যেন বললে আমায় ডেকে,
'দিঘির ধারে ওই-যে কিসের আলো!'
এমন সময় 'হাঁরে রে রে রে রে
ওই যে কারা আসতেছে ডাক ছেড়ে।
তুমি ভয়ে পালকিতে এক কোণে
ঠাকুর-দেবতা স্মরণ করছ মনে,

বেয়ারাগুলো পাশের কাঁটাবনে
পালকি ছেড়ে কাঁপছে থরথর।
আমি যেন তোমায় বলছি ডেকে,
'আমি আছি, ভয় কেন মা করো!'

তুমি বললে, 'যাস নে খোকা ওরে',
আমি বলি, 'দেখো-না চুপ করে।'
ছুটিয়ে ঘোড়া গেলেম তাদের মাঝে,
ঢাল তলোয়ার ঝনঝনিয়ে বাজে,
কী ভয়ানক লড়াই হলো মা যে,
শুনে তোমার গায়ে দেবে কাঁটা।
কত লোক যে পালিয়ে গেল ভয়ে,
কত লোকের মাথা পড়ল কাটা।

এত লোকের সঙ্গে লড়াই করে,
ভাবছ খোকা গেলই বুঝি মরে।

আমি তখন রক্ত মেখে ঘেমে
বলছি এসে, 'লড়াই গেছে থেমে',
তুমি শুনে পালকি থেকে নেমে
চুমো খেয়ে নিচ্ছ আমায় কোলে
বলছ, 'ভাগ্যে খোকা সঙ্গে ছিল
কী দুর্দশাই হতো তা না হলে!'

(অংশবিশেষ)

২০২৫

অনুশীলনী

১. জেনে নিই।

শিশুরা কল্পনা করতে ভালোবাসে। এই কবিতাটিও তেমনি এক ছোট্ট শিশুর কল্পনা। কল্পনায় সে মায়ের সঙ্গে দূর দেশে যায়। পথে সে ডাকাতদের মোকাবেলা করে, বীরের মতো লড়াই করে মাকে রক্ষা করে।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি, অর্থ বলি এবং নতুন বাক্য লিখি।

টগবগিয়ে রাঙা পাট জোড়াদিঘি স্মরণ বেয়ারা (বেহারা) থরথর ঝনঝনিয়ে দুর্দশা সোঁতা

৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. খোকা মাকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছে?

খ. মা ও খোকা কীভাবে যাচ্ছে?

গ. তারা কখন জোড়াদিঘির ঘাটে পৌঁছাল? এমন সময় কী ঘটল?

ঘ. বেয়ারারা কোথায় পালাল?

ঙ. 'ভাগ্যে খোকা সঙ্গে ছিল' – মা একথা বললেন কেন?

চ. বীরপুরুষ কে? সে কাদের হারিয়ে বীরপুরুষ হলো?

৪. নিচের শব্দগুলোর মধ্যে অর্থের পার্থক্য জেনে নিই ও শব্দ দিয়ে তৈরি বাক্যগুলো শুদ্ধ উচ্চারণে পড়ি।

কাটা – অঘ্রাণ মাসে ধান কাটা শেষ হয়েছে।

কাঁটা – চোরাকাঁটায় মাঠ ভরে আছে।

কোন – তুমি কোন কাজ করবে?

কোণ – ঘরের কোণে বসে থাকলে চলবে না, কাজে নেমে পড়ো।

৫. বিপরীত শব্দ জেনে নিই ও বাক্য তৈরি করি।

ভয়	–	সাহস	সাহসের কাছে সবাই পরাজিত হয়।
বিদেশ	–	স্বদেশ	....
দূরে	–	কাছে	....
সকাল	–	সন্ধ্যা	....
আলো	–	আঁধার	....

৬. 'বীরপুরুষ' কবিতায় 'ধু-ধু' শব্দ আছে, এ রকম আরও কয়েকটি শব্দ বাক্যে ব্যবহার করি।

ধু-ধু	–	চারদিকে মানুষজন নেই, গ্রামটা যেন ধু-ধু করছে।
হু-হু	–	হু-হু করে হাওয়া বইছে।
সোঁ-সোঁ	–	সোঁ-সোঁ করে বাতাস ছুটছে।
ঝনঝন	–	কাচের আয়নাটা ঝনঝন করে ভেঙে গেল।
ভনভন	–	ময়লা জায়গাটায় ভনভন করে মাছি উড়ছে।

৭. কবিতাটি স্পষ্ট ও শুদ্ধ উচ্চারণে স্বাভাবিক গতিতে আবৃত্তি করি।

৮. কর্ম-অনুশীলন।

আমি যদি বীরপুরুষ হতাম তাহলে কী করতাম তা লিখে জানাই।

কবি-পরিচিতি
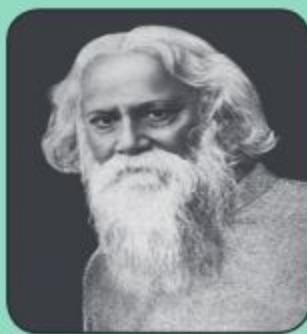
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই মে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শুধু কবি নন; কথাসাহিত্যিক, নাট্যকার, দার্শনিক, গীতিকার, সুরস্রষ্টা, চিত্রশিল্পী, সমাজসেবী ও শিক্ষাবিদ। তাঁর রচনাভাণ্ডার বিশাল। তিনি কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক রচনা করেছেন। এ ছাড়াও তিনি বহু চিঠিপত্র লিখেছেন। 'বীরপুরুষ' কবিতাটি তাঁর 'শিশু' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই আগস্ট তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

পাহাড়পুর

চারিদিকে কোনো পাহাড় নেই, কিন্তু জায়গার নাম পাহাড়পুর। এটি বাংলাদেশের, এমনকি বিশ্বের একটি বিখ্যাত জায়গা। কিন্তু এর সম্পর্কে সবাই খুব ভালো জানে না। তোমরা কি জানো যে, পাহাড়পুর একটি সুপ্রাচীন বৌদ্ধবিহার?
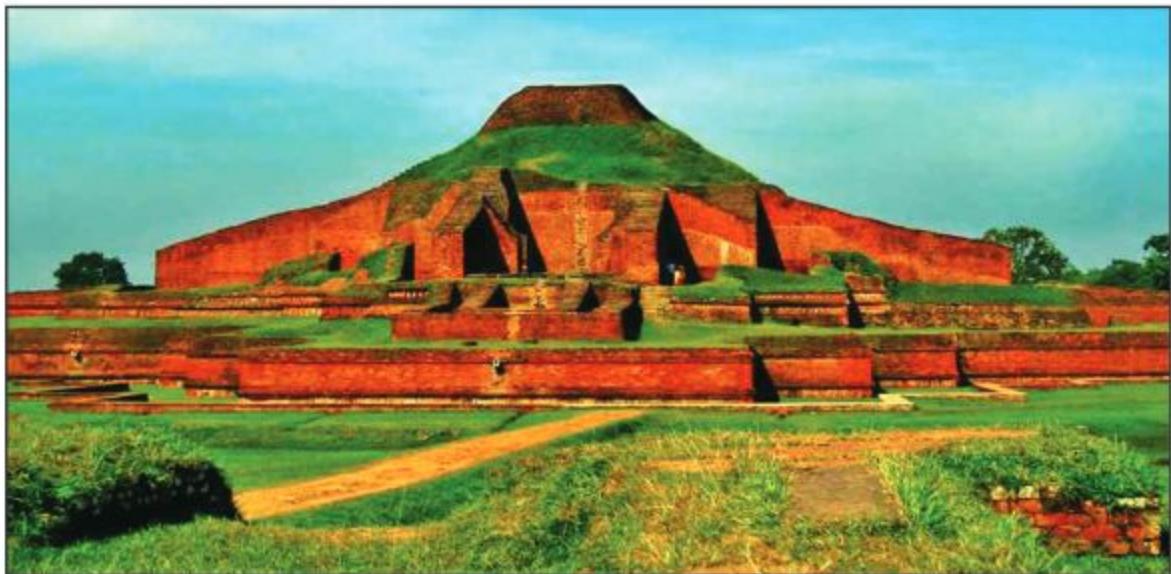
পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার

প্রায় ১৪শ বছর আগে বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী ভিক্ষুগণ কোনো বিশেষ একটা জায়গায় থাকতেন। সেখানে তাঁরা নিজেদের ধর্মচর্চা করতেন আর শিষ্যদের শিক্ষা দিতেন। এরকম জায়গার নাম বিহার। বাংলাদেশের ভিতরে আরও বিহার আছে, যেমন কুমিল্লার ময়নামতির শালবন বিহার। কিন্তু পাহাড়পুরের মতো বড় বিহার আর নেই। প্রাচীন এ বিহার একসময় খালি পড়ে ছিল। অনেকে মনে করেন যুগযুগ ধরে উড়ে আসা ধুলাবালি ও মাটি এটির চারদিকে জমতে থাকে। একসময় মাটির স্তূপে এটি ঢাকা পড়ে পাহাড়ের মতো হয়ে যায়। সেই থেকে নাম হয়ে যায় পাহাড়পুর। দীর্ঘকাল পরে ১৮৭৯ সালে আলেকজান্ডার কানিংহাম এই বিশাল পুরাকীর্তি আবিষ্কার করেন। এটির আরেক নাম সোমপুর বিহার বা সোমপুর মহাবিহার।

এই বিহারটি নওগাঁ জেলার বদলগাছি উপজেলার পাহাড়পুর গ্রামে অবস্থিত। বিহার এলাকাটি প্রায় ৪০ একর জায়গা জুড়ে লালচে মাটির ভূমিতে বিস্তৃত। ২৭ একর জমির উপর এর বিশাল দালান। উত্তর-দক্ষিণে এটি ৯২২ ফুট আর পূর্ব-পশ্চিমে ৯১৯ ফুট বিস্তৃত। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী রাজা দ্বিতীয় ধর্মপাল প্রায় ১২শ বছর আগে এটি নির্মাণ করেন।

একদম নিচে মাটির অংশে এটি চারকোনা আকারের। বাইরের দেয়ালের গায়ে পোড়ামাটি দিয়ে নানান রকম ফুল-ফল, পাখি, পুতুল, মূর্তি ইত্যাদি বানানো আছে। উত্তর দিকের ঠিক মাঝখানে মূল দরজা। তার পরেই বড়ো হলঘর। পাশে দুটি ছোটো হলঘর। চারিদিকে দেয়ালের ভিতরে সুন্দর সারি বাঁধা ১৭৭টি ছোটো ঘর। সামনে দিয়ে আছে লম্বা বারান্দা। বিহারটিতে আছে পুকুর, কূপ, স্নানঘাট, স্নানঘর, রান্নাঘর, খাবারঘর ও শৌচাগার। সব মিলিয়ে বিহারটিতে ৮০০ মানুষের থাকার ব্যবস্থা ছিল। পাহাড়পুর ছিল তখনকার দিনে উচ্চশিক্ষার প্রাণকেন্দ্র।

পাহাড়পুর বিহারের পোড়া মাটির ফলক

ভিতরটায় বিশাল উঠানের মাঝখানে বড়ো এক সুন্দর মন্দির। ধাপে ধাপে উচু করে মন্দিরটা বানানো হয়েছে। পোড়ামাটির দুই হাজার ফলকের চিত্র দিয়ে মন্দিরের বাইরে আর ভেতরে সাজানো। একই রকম ছোটোছোটো মন্দির পুরো বিহারের নানান জায়গায় আছে। বিহারটির পূর্ব-দক্ষিণ কোণে দেয়ালের বাইরে একটা বাঁধানো ঘাট আছে। এটাকে বলা হয় সন্ধ্যাবতীর ঘাট।

পাহাড়পুর বিহারের পাশে আছে দেখার মতো একটা জাদুঘর। সেখানে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা আছে বিহার থেকে খনন করে পাওয়া অনেক পুরাতন আর দুর্লভ জিনিসপত্র।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

বিহার সুপ্রাচীন ভিক্ষু স্তূপ বিশাল প্রাণকেন্দ্র দুর্লভ আবিষ্কার স্নানঘাট ধর্মচর্চা

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

প্রাণকেন্দ্র	স্তূপ	দুর্লভ	বিশাল	বিহার	সুপ্রাচীন

ক. পাহাড়পুর ছাড়াও আমাদের দেশে আরও .... রয়েছে।

খ. আমাদের দেশে .... মঠ রয়েছে।

গ. টেবিলের উপর ধুলোবালি পড়ে ময়লার .... হয়ে আছে।

ঘ. আকাশ অনেক ....।

ঙ. ঢাকা বাংলাদেশের ....।

চ. জাদুঘরে অনেক .... জিনিস দেখতে পাওয়া যায়।

৩. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিই।

ক. বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী ভিক্ষুগণ থাকতেন –

১. বৌদ্ধ বিহারে　　২. পাহাড়পুরে

৩. বদলগাছিতে　　৪. জামালপুরে

খ. আলেকজান্ডার কানিংহাম এই পুরাকীর্তি আবিষ্কার করেন –

১. ১৭৭৯ সালে　　২. ১৮৭৯ সালে

৩. ১৯৭৯ সালে　　৪. ১৬৭৯ সালে

গ. বিহার এলাকাটি বিস্তৃত –

১. ৫০ একর জুড়ে　　২. ৪০ একর জুড়ে

৩. ৬০ একর জুড়ে　　৪. ৩০ একর জুড়ে

৪. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. পাহাড়পুর নামটা কীভাবে হলো?

খ. এখানে কতবছর আগে কারা থাকত?

গ. বিহারটির মাঝখানে কী কী আছে?

ঘ. বৌদ্ধ বিহারটির মাটি ও দেয়াল কোন রঙের এবং কী দিয়ে তৈরি?

৫. বাম পাশের শব্দাংশের সাথে ডান পাশের ঠিক শব্দাংশ মিলিয়ে বাক্য পড়ি ও লিখি।

বাম পাশ	ডান পাশ
পাহাড়পুর একটি সুপ্রাচীন	১৭৭টি ছোট ঘর।
ভিক্ষুগণ সেখানে	সোমপুর মহাবিহার।
মাটির স্তূপে ঢাকা পড়ে	বৌদ্ধবিহার।
পাহাড়পুরের আরেক নাম	সন্ধ্যাবতীর ঘাট।
ভিতরে সুন্দর সারি বাঁধা	পাহাড় হয়ে যায়।
বিহারের দক্ষিণ কোণে রয়েছে	ধর্মচর্চা করতেন।

৬. বাক্য রচনা করি।

ভিক্ষু ধর্মচর্চা আবিষ্কার প্রাণকেন্দ্র স্নানঘাট

৭. কথাগুলো বুঝে নিই।

উড়ে আসা – বাতাসের সঙ্গে যা কিছু উড়ে আসতে পারে তাকে বলে উড়ে আসা। যেমন: উড়ে আসা গাছের পাতা, উড়ে আসা পাখি ইত্যাদি।

পাড়ি দেওয়া – এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পৌঁছানো বা পার হওয়াকে বলা হয় পাড়ি দেওয়া। যেমন–সাত সমুদ্র পাড়ি দেওয়া সবার কাজ নয়।

দুর্লভ জিনিসপত্র – যেসকল জিনিস সহজে লভ্য নয় বা পাওয়া যায় না, তাকেই দুর্লভ জিনিসপত্র বলে।

৮. কর্ম অনুশীলন।

ক. পাঠে যেসব স্থান ও ব্যক্তির নাম আছে, সেসব নামের একটি তালিকা তৈরি করি। আমার তালিকাটি পাশের বন্ধুর সাথে মিলিয়ে নিই।

খ. ময়নামতির ‘শালবন বিহার’ দিয়ে ৫টি বাক্য লিখি।

লিপির গল্প

শিক্ষক : আমি আজ একটি গল্প বলব। গল্প হলেও এর কিছুটা সত্য, কিছুটা অনুমান, আর কিছুটা বানানো।

মনজুলা : স্যার, আমারও গল্প বানাতে ভালো লাগে।

শিক্ষক : খুব ভালো। গল্প বানাতে হলে কিন্তু গল্প শুনতে হবে, গল্প পড়তে হবে, গল্প লিখতেও হবে।

রাজা গণেশের আমলের মুদ্রায় বাংলা বর্ণের প্রতিলিপি

সুলতান গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহের আমলের পাথরে খোদিত বাংলা লেখা

আলো : আচ্ছা, এখন আমরা গল্প শুনব। কিন্তু কোন গল্প? রাক্ষস-খোক্ষসের গল্প, বেঙমা-বেঙমির গল্প, নাকি সুয়োরানি-দুয়োরানির গল্প?

শিক্ষক : তোমরা অনেক গল্প জান। আজ একটা গল্প বলব। লিপির গল্প।

অনজু : লিপির গল্প! শুনিনি তো কোনো দিন!

শিক্ষক : লিপি মানে লেখা। কোনো শব্দ শুনে লেখা, জিনিস দেখে লেখা। চিন্তা করে মনের কথা লেখা। এই লেখা কেমন করে মানুষ পেল, কেমন করে আবিষ্কার করল, কেমন করে অভ্যাস করল তাই বলব। লিপির গল্প মানে লেখার ইতিহাস।

হাসান : মজা তো!

শিক্ষক : অনেক দিন আগের কথা। একশো, দুশো বছর নয়। এক হাজার দুহাজার বছর নয়। প্রায় ছয়-সাত হাজার বছর আগে পৃথিবীতে লোকজন লিখতে ও পড়তে জানত না। জানবে কী করে? তখন তো বর্ণ বলে কিছু ছিল না।

২০২৫

আদিত্য : অ্যাঁ, বর্ণমালা ছিল না? মানে অ আ ক খ কিছুই ছিল না?

শিক্ষক : সত্যিই কোনো ভাষার কোনো বর্ণমালা বা হরফ কিছুই ছিল না। তখন লিখতে জানা লোক ছিল না, সাক্ষর লোকও ছিল না।

আমিনা : তাহলে তারা চিঠি লিখত কী করে?

শিক্ষক : তখন চিঠিপত্র ছিল না, বইপত্র ছিল না, কালি-কলম ছিল না। সেকালে দাদা-দাদি, বাবা-মা বাচ্চাদের গল্প বানিয়ে বানিয়ে শোনাতেন। বড়োরা গল্প করতেন আর ছোটোরা গল্প শুনত। গল্প শুনে শুনে বড়ো হয়ে নিজেরা আবার ছোটোদের গল্প বানিয়ে শোনাত।

বাংলা বর্ণের ক্রমবিকাশ

সুজিত : আচ্ছা, ভুলে গেলে তারা কী করত?

শিক্ষক : খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছ। ভুলে গেলে তখন আর গল্প বলতে পারত না। আবার নতুন করে নতুন গল্প বানাতে হতো। সে জন্যই ভুলে যাওয়ার বিপদ থেকে বাঁচার জন্য লিপি তৈরির চিন্তা মাথায় এলো। শূন্যে মিলিয়ে যাওয়া কথাকে রেখার বন্ধনে বন্দি করার ফন্দি হলো লিপি।

২০২৫

নাহিদ : এখন যেমন কথাবার্তা, গানবাজনা, আবৃত্তি, বক্তৃতা প্রভৃতি ইলেক্ট্রনিক ডিভাইসে ধরে রাখা হয়, সে রকম?

শিক্ষক : ঠিক বলেছ, অনেকটা তাই। এখন যন্ত্রের মধ্যে কথাকে বন্দি করে রাখা হয়। তখন হাতে আঁকা রেখায় কথাকে বন্দি করে রাখা হতো। কথাকে রেখার বন্ধনে বন্দি করে রাখার জন্যই তৈরি হয়েছিল লিপি। লিপিকে কেউ বলেন লিখন পদ্ধতি। কেউ বলেন বর্ণ। কেউ বলেন হরফ। কেউ বলেন অক্ষর। মানুষ যেদিন লিপি দিয়ে কথাকে বন্দি করে রাখতে শিখল, সেদিন থেকেই সভ্যতার পথে নতুন যাত্রা শুরু হলো।

হাসান : লিপি আবিষ্কার করলেন কে?

শিক্ষক : প্রাগৈতিহাসিক কালে কে কখন কীভাবে লিপি আবিষ্কার করেছিলেন, তা কেউ ঠিকভাবে বলতে পারবে না। আধুনিক কালে যাঁরা এ ধরনের কাজ করেছেন, তাঁদের কারো কারো নাম জানা যায়। যেমন- কোরিয়ার রাজা সে জং এবং ইউরোপের এক ধর্মযাজক সন্ত সিরিল।

টমাস : বাংলা লিপি কীভাবে এলো?

শিক্ষক : বাংলা লিপি কে প্রচলন করেছেন তা জানা যায় না। প্রাচীন ব্রাহ্মী লিপি থেকে অশোক লিপি, অশোক লিপি থেকে কুটিল লিপি এবং কুটিল লিপি থেকে বঙ্গলিপি। তবে লিপির নানা ধাপ পেরিয়ে বঙ্গলিপি থেকেই বাংলা লিপি এসেছে বলে পণ্ডিতদের ধারণা।

শিউলি : স্যার পৃথিবীতে কত লিপি ছিল?

শিক্ষক : কত লিপি ছিল তা সঠিক কেউ জানে না। অনেক লিপি কালে কালে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অনেক লিপির নমুনা পাওয়া গেছে, যেমন: মহেঞ্জোদারোর লিপি, মিশরীয় লিপি। তবে এগুলোর পাঠ উদ্ধারের জন্য এখনও ভাষাবিজ্ঞানী ও প্রত্নতাত্ত্বিকেরা গবেষণা করছেন। তোমরা বড়ো হয়ে প্রাচীন লিপি সম্পর্কে আরও জানতে পারবে।

২০২৫

অনুশীলনী

১. জেনে নিই।

লিপির গল্পটি একটি কথোপকথনধর্মী রচনা। ধ্বনির প্রতীক হিসেবে কীভাবে ধীরে ধীরে বর্ণের রূপ পেয়েছে, এই রচনায় তার ধারণা দেওয়া হয়েছে। এখানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের আলোচনার মাধ্যমে লিপিমালা আবিষ্কারের তথ্য জানানো হয়েছে।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

অভ্যাস সাক্ষর বন্ধন বঙ্গালিপি রূপান্তর

৩. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

অভ্যাস	বন্ধন	সাক্ষর	রূপান্তর	বঙ্গালিপি

ক. .... লোকের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে।

খ. চা খাওয়ার সময় বাবার পত্রিকা পড়ার ....।

গ. বাক্যটি বংলা থেকে ইংরেজি ভাষায় .... করো।

ঘ. বাংলা লিপির পুরোনো নাম ....।

ঙ. মানুষের সাথে মানুষের .... দৃঢ় হোক।

৪. শূন্যস্থান পূরণ করি।

তুমি খুব .... প্রশ্ন করেছ।

আবার নতুন করে নতুন .... বানাতে হতো।

লিপিকে কেউ বলেন ....।

বঙ্গালিপি থেকেই ....এসেছে।

৫. নিচের শব্দগুলো দিয়ে বিপরীত শব্দ লিখি ও বাক্য রচনা করি।

বিলুপ্ত – ....

শিক্ষক – ....

আনন্দ – ....

চিন্তা – ....

আবিষ্কার – ....

সাক্ষর – ....

প্রাচীন – ....

৬. মুখে মুখে উত্তর বলি ও লিখি।

ক. লিপি বলতে কী বুঝি?

খ. লিপি তৈরির চিন্তা এলো কীভাবে?

গ. লিপি আবিষ্কারকদের নাম লিখি।

ঘ. বাংলা লিপি কীভাবে এলো?

ঙ. কখন থেকে মানুষের সভ্যতার পথে নতুন যাত্রা শুরু হলো?

৭. বুঝিয়ে বলি।

শূন্যে মিলিয়ে যাওয়া কথাকে রেখার বন্ধনে বন্দি করার ফন্দি হলো লিপি।

৮. কর্ম-অনুশীলন।

পাঠের সংলাপগুলো শিক্ষকের সহায়তায় অভিনয় করি।

খলিফা হযরত উমর (রা)

হযরত উমর ফারুক (রা) পবিত্র মক্কা নগরীতে ৫৮৩ খ্রিষ্টাব্দে কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম খাত্তাব ও মাতার নাম হানতামাহ্।

তিনি ছিলেন ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা। তিনি শিক্ষিত, মার্জিত ও সৎ চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। বাল্যকালে তিনি শিক্ষা-দীক্ষায় সুনাম অর্জন করেন। বড়ো হয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করেন। তিনি ছিলেন নামকরা কুস্তিগির, সাহসী যোদ্ধা, কবি ও সুবক্তা।

হযরত উমর (রা) প্রথমে ছিলেন ইসলামের ঘোরতর বিরোধী। একদিন মহানবি (স)-কে হত্যা করার জন্য তিনি কোষমুক্ত তরবারি নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। পথিমধ্যে জানতে পারেন যে, তাঁর বোন ফাতিমা ও ভগ্নিপতি সাঈদ মুসলমান হয়ে গেছেন। এতে তিনি ক্রোধে অস্থির হয়ে বোনের বাড়িতে উপস্থিত হন। কিন্তু তিনি ইসলামের প্রতি বোন ও ভগ্নিপতির দৃঢ়তা দেখে বিস্মিত হয়ে যান। তাঁর মানসিক পরিবর্তন ঘটে। তিনি মুসলমান হওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েন এবং নবি করিম (স)-এর দরবারে গিয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। মুসলমান হয়ে তিনি দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা দেন, 'আর গোপনে নয়, এবার প্রকাশ্যে কাবা ঘরের সামনে সালাত আদায় করব।' মহানবি (স) খুশি হয়ে তাঁকে উপাধি দেন 'ফারুক' অর্থাৎ সত্য ও মিথ্যার প্রভেদকারী।
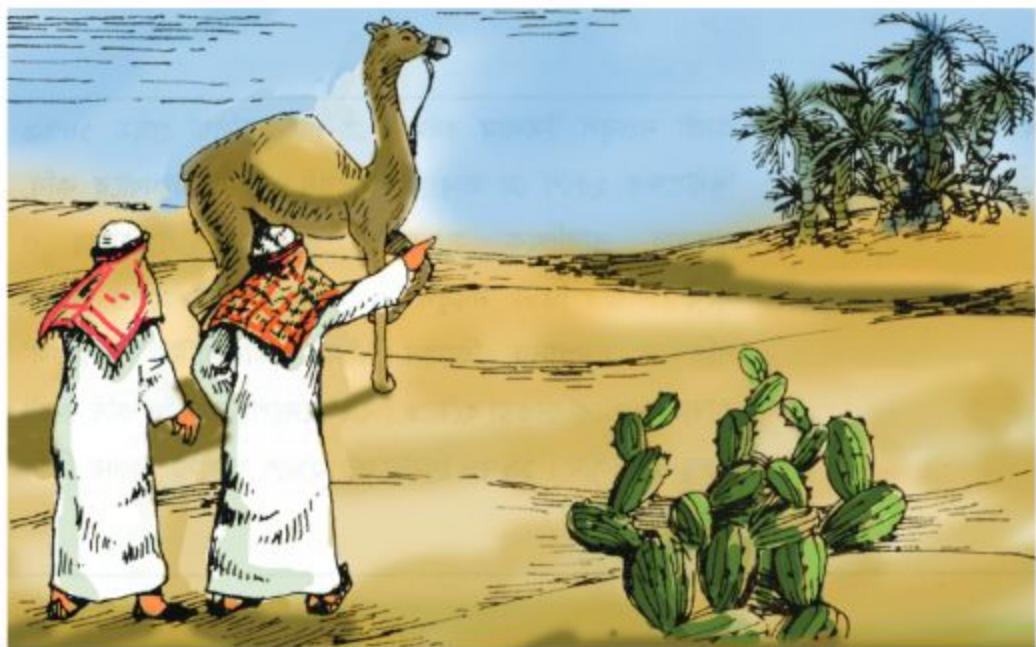
হযরত উমর (রা) একদিকে ছিলেন কোমল, অন্যদিকে কঠোর। তিনি মানুষের দুঃখ-কষ্টে ছিলেন সমব্যথী। দেশের মানুষের দুঃখ-কষ্টের কথা জানার জন্য তিনি গভীর রাতে মহল্লায় মহল্লায় একাকী ঘুরে বেড়াতেন। ক্ষুধার্ত শিশুদের কান্নার আওয়াজ শুনে তিনি নিজের কাঁধে আটার বস্তা বহন করে নিয়ে তাদের তাবুতে যেতেন। তিনি সহধর্মিণী উম্মে কুলসুমকে নিয়ে এক বেদুইনের ঘরে যান, তার অসুস্থ স্ত্রীকে সাহায্য করার জন্য।

খলিফা উমর (রা)-এর বিচার ব্যবস্থা ছিল নিরপেক্ষ ও নিখুঁত। তাঁর চোখে উঁচু-নিচু, ধনী-গরিব, আপন-পর কোনো ভেদাভেদ ছিল না। মদ্যপানের অপরাধে নিজের ছেলে আবু শাহমাকে তিনি কঠোর শাস্তি দিয়েছিলেন। রাষ্ট্রের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ তিনি সাহাবিদের সাথে পরামর্শ করে সম্পাদন করতেন।

একদিন তিনি এক ক্রীতদাসকে সাথে নিয়ে জেরুজালেম যাচ্ছিলেন। একটিমাত্র উটে একজনই চড়া যায়। তিনি সঙ্গী ক্রীতদাসকে বললেন, "দুইজন দূরের পথ পাড়ি দেব। একবার তুমি উটে চড়বে আর একবার আমি।" এভাবে যখন তাঁরা জেরুজালেম শহরের নিকট পৌছালেন, তখন ক্রীতদাসের উটে চড়ার পালা ছিল। উটের পিঠে ক্রীতদাসকে দেখে শহরের লোকজন মনে করল ইনিই খলিফা। তারা উটের পিঠে বসা ক্রীতদাসকে খলিফা ভেবে সালাম দিতে লাগল। ক্রীতদাস তখন লজ্জিত হয়ে বললেন, "আমি নই, উটের রশি ধরে আছেন যিনি, তিনিই খলিফা।" উপস্থিত সবাই বিস্মিত হয়ে গেল হযরত উমর (রা)-এর মহানুভবতা দেখে।

হযরত উমর (রা) ছিলেন মানবদরদি। ইসলামি শাসন ব্যবস্থায় জনগণের মতো শাসকদের জন্যও রয়েছে একই আইনের বিধান। একবার হযরত উমর (রা)-কে একজন সাধারণ লোকের সামনে জবাবদিহি করতে হয়েছিল। অভিযোগটি ছিল এই যে, বায়তুল মাল থেকে প্রাপ্ত কাপড় দিয়ে কারো পুরো একটি জামা হয়নি, অথচ খলিফার গায়ে সেই কাপড়ের পুরো একটি জামা দেখা যাচ্ছে। খলিফা অতিরিক্ত কাপড় কোথা থেকে পেলেন? খলিফার পক্ষ থেকে তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ উত্তর দিলেন, "আমি আমার অংশটুকু আব্বাকে দিয়েছি। এতে তাঁর জামা তৈরি হয়েছে।" খলিফা হিসেবে তিনি কোষাগার থেকে মাত্র দুই দিরহাম গ্রহণ করতেন আর বলতেন, "যদি না নিয়ে পারতাম তা হলে জনগণের টাকা নিতাম না।"

এই জনদরদি শাসকের কথা লোকমুখে শুনে রোম সম্রাট পত্র দিয়ে এক দূত পাঠান। সম্রাটের দূত আরব দেশে এসে প্রথমে খোঁজাখুঁজি করেন 'খলিফা ভবন'। কোনো লোকই খলিফা ভবন দেখাতে পারেনি। শেষে একজন বলল, কিছুক্ষণ আগে দেখেছিলাম খেজুর গাছের ছায়ায়

খলিফা ঘুমোচ্ছেন। রোম সম্রাটের দূত তাঁকে খেজুর গাছের ছায়ার নিচে ঘুমোতে দেখে অবাক হন। তিনি বুঝতে পারেন হযরত উমর (রা) জনগণের প্রকৃত নেতা ।

হযরত উমর (রা) ছিলেন ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ। ইসলাম ধর্ম প্রচার-প্রসারের জন্য তিনি তাঁর ধনসম্পদ বিলিয়ে দেন। তিনি মহানবি (স)-এর সঙ্গী হয়ে বীরত্বের সাথে সব যুদ্ধে অংশ নেন। এই বীরপুরুষ ৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

ইসলামের এই মহান খলিফা নিজের জীবনে অনেক ভালো কাজ করেছেন এবং আমাদের জন্যও অনেক উপদেশ রেখে গেছেন। তাঁর দেওয়া উপদেশগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আগে আগে সালাম দেওয়া, কোনো কাজ করার আগে অভিজ্ঞ লোকদের পরামর্শ নেওয়া, যেকোনো কাজ মনোযোগ দিয়ে করা, সবার প্রতি সুবিচার করা ইত্যাদি।

তাঁর মহৎ জীবন ও মহান উপদেশ যুগ যুগ ধরে মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছে ও ভালো কাজে উৎসাহ যুগিয়েছে।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি, অর্থ বলি এবং শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করি ।

কুস্তিগির কোষমুক্ত যোদ্ধা সুবক্তা বিস্মিত সালাত ব্যাকুল ফারুক স্বীয় সংমিশ্রণ পুষ্প দিরহাম বায়তুলমাল জবাবদিহি পত্র

২. ডান দিক থেকে ঠিক শব্দ বেছে নিয়ে খালি জায়গায় লিখি ।

ক. হযরত উমর (রা) ছিলেন .... ।

খ. একদিন তিনি এক .... সঙ্গী নিয়ে .... যাচ্ছিলেন

গ. হযরত উমর (রা) পবিত্র .... নগরীতে .... বংশে জন্মগ্রহণ করেন।

ঘ. তাঁর মাতার নাম .... ও পিতার নাম .... ।

ঙ. তিনি মানুষের দুঃখকষ্টে ছিলেন ....।

মক্কা, কুরাইশ
হানতামাহ্, খাত্তাব
ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা
ক্রীতদাস, জেরুজালেম
সমব্যথী

২০২৫

৩. ডান দিক থেকে শব্দ বেছে নিয়ে বাঁ দিকের শব্দের সঙ্গে মিল করি।

শিক্ষা	নির্জনে
শত্রু	বাণিজ্য
সুনাম	মিত্র
ব্যবসা	বদনাম
প্রকাশ্যে	মহৎ কাজ

৪. বাক্য গঠন করি

খলিফা চরিত্র তরবারি নিখুঁত শান্তি কোমল কঠোর দরদি আদর্শ কোষাগার।

৫. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. হযরত উমর (রা) কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

খ. তাঁর মাতাপিতার নাম কী?

গ. তিনি কীভাবে মুসলমান হলেন?

ঘ. হযরত মুহাম্মদ (স) উমর (রা)-কে কী উপাধি দিয়েছিলেন?

ঙ. হযরত উমর (রা)-এর বিচারব্যবস্থা কেমন ছিল?

চ. প্রজাদের প্রতি হযরত উমর (রা)-এর ভালোবাসার একটি উদাহরণ দাও।

ছ. হযরত উমর (রা)-এর উপদেশগুলো কী কী?

৬. হযরত উমর (রা) সম্পর্কে ৫টি বাক্য লিখি ও পড়ি।

....

....

....

....

....

শব্দের অর্থ জেনে নিই

শব্দ	অর্থ
অ	
অকুতোভয়	– ভয় নেই যার।
অগোচর	– চোখের আড়ালে থাকা।
অগ্রদূত	– যিনি পথ দেখান, সবার আগে আগে চলেন।
অঙ্গ	– শরীরের অংশ।
অঞ্চল	– স্থান, দেশের ভূখণ্ডের বিভাগ, রাজ্য।
অতিক্রম	– কোনো কিছু পার হওয়া বা ছাড়িয়ে যাওয়া।
অদৃশ্য	– যা চোখে দেখা যায় না, অগোচর।
অধিকার	– দাবি, পাওনা জিনিসের ওপর দখল নেওয়া।
অনুবীক্ষণ	– মাইক্রোস্কোপ, এমন একটি যন্ত্র যার মাধ্যমে ছোটো জিনিসকে বড়ো দেখা যায়।
অবজ্ঞা	– তাচ্ছিল্য, তুচ্ছ।
অবধি	– পর্যন্ত।
অবিস্মরণীয়	– ভুলবার নয় এমন।
অভ্যর্থনা	– সাদরে গ্রহণ।
অভূতপূর্ব	– পূর্বে যা দেখা যায়নি বা ঘটেনি।
অভ্যাস	– স্বভাব।
অসহ্য	– যা সহ্য করা বা সওয়া যায় না।
অসুখ-বিসুখ	– রোগ-ব্যাধি।
অস্ত্র	– হাতিয়ার।
অস্তগামী	– পশ্চিম দিকে ঢলে পড়েছে এমন।
অশ্রদ্ধা	– অবজ্ঞা, ঘৃণা।
আ	
আদুল	– খালি গায়ে বা জামাকাপড় ছাড়া।
অ্যানটেনা	– কোনো বেতার যন্ত্রের সাথে লাগানো তার বা অংশ যা দিয়ে যন্ত্রটি তরঙ্গ ধরতে পারে।
আবদার	– বায়না।
আবিষ্কার	– উদ্ভাবন, নতুন কিছু তৈরি।
আলিঙ্গন করা	– কোলাকুলি করা।
আয়েস	– আরাম।
ই	
ইলশেগুঁড়ি	– হালকা ঝিরঝিরে বৃষ্টি। এ ধরনের বৃষ্টিতে নদীতে জাল ফেলে জেলেরা ইলিশ মাছ অনেক বেশি পায়। এ কারণেই এমন বৃষ্টির নাম ইলশেগুঁড়ি।
ইতি টানা	– শেষ করা।
উ	
উন্নত শির	– মাথানত করে না এমন, দৃঢ়চেতা।
উদারতা	– সরলতা।
উদ্ভাবন	– আবিষ্কার করা, আগে ছিল না এমন কিছু তৈরি করা।
উন্নতি	– কিছুটা খারাপ অবস্থা থেকে ভালো অবস্থায় যাওয়া।
এ	
একরত্তি	– সামান্যতম, অতিশয় অল্প।
এসএমএস	– (Short Message Service) ক্ষুদেবার্তা।
ঐ	
ঐতিহাসিক	– ইতিহাস সংক্রান্ত।

১০৫

ক

কসুর – দোষ।
কদর – সম্মান, খাতির।
কদলী – কলা।
কামার – যারা লোহা দিয়ে জিনিসপত্র তৈরি করেন।
কুমার – কুমোর। যারা মাটি দিয়ে হাঁড়ি, সরা ইত্যাদি তৈরি করেন।
কুস্তিগির – কুস্তি খেলোয়াড়।
করুণ – কাতর, বেদনাপূর্ণ।
কষে – জোরে।
কৃষিকাজ – চাষাবাদ।
ক্লেশ – দুঃখ, কষ্ট।
কোষমুক্ত – খাপ থেকে বের করে আনা।
ক্রলিং – যুদ্ধকালে চার হাত-পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যাওয়া।

ক্ষ

ক্ষীর – দুধ দিয়ে তৈরি মিষ্টান্ন।

খ

খনি – মূল্যবান পদার্থের প্রাকৃতিক উৎস।
খাপ্পা – রাগান্বিত হওয়া।
খাবলে খাওয়া – খাবলা মানে হাতের থাবা পরিমাণ। খাবলে খাওয়া বললে এক থাবায় যতটুকু তুলে খাওয়া যায় তাই বোঝায়।
খাস – আসল, প্রকৃত।
খ্যাত – সুপরিচিত, বিখ্যাত।

গ

গগন – আকাশ
গবেষক – যিনি গবেষণা করেন।
গম্বুজ – চূড়া।
গ্রীষ্ম – গরমকাল, বাংলা ছয়টি ঋতুর প্রথম ঋতু।

ঘ

ঘনিয়ে এলো – ঘন হয়ে এল, আসন্ন।
ঘুম – তন্দ্রা, নিদ্রা।
ঘোড়ার নালের চাট – ঘোড়ার পায়ের লাথি।
ঘ্যাচাং ঘ্যাচ – এক কোপে কিছু কেটে ফেলার আওয়াজ।

চ

চঞ্চল – অস্থির, অশান্ত, চটপটে।
চমৎকার – সুন্দর, মনোহর।
চর – গোপন খবর সংগ্রহ করে দেন যিনি। যুদ্ধের কৌশল হিসেবে এই চর নিয়োগ করা হয়।
চাষাবাদ – কৃষিকাজ।
চিরস্মরণীয় – সব সময় মানুষ যাকে স্মরণ করে, মনে রাখে।
চিলেকোঠা – বাড়ির ছাদে লাগোয়া ঘর। সিঁড়িঘর।
চুক্তি – দুই বা ততোধিক পক্ষের মধ্যে কোনো বিষয়ে বিরোধ নিষ্পত্তির ঐকমত্য।
চেটেপুটে – চাটা মানে জিহ্বা দিয়ে লেহন করা। জিহ্বা আর ঠোঁট দিয়ে একসাথে চেটে-চুষে খেলে হয় চেটেপুটে খাওয়া।
চৌকাঠ – দরজার চারিদিকের কাঠের চারকোনা কাঠামো বা ফ্রেম।

ছ

ছিনু – ছিলাম।

জ

জবাবদিহি – কৈফিয়ত দেওয়া।
জমিদার – ধনী ব্যক্তি, যিনি বহু জমি ও বিষয় সম্পত্তির মালিক।
জয়ঢাক – জয়ী হওয়ার পর যে ঢাক (এক ধরনের বাদ্য) বাজানো হয়।
জ্ঞানী – জ্ঞানবান লোক, যাঁর অনেক জ্ঞান।
জন্মভূমি – যে ভূমি বা দেশে একজন জন্মায় সে দেশ তার জন্মভূমি।
জোনাই – জোনাকি পোকা।
জোড়াদিঘি – যেখানে পাশাপাশি দুটি দিঘি রয়েছে।

ঝ

ঝনঝনিয়ে – ঝনঝন শব্দ করে।
ঝুঁটি – খোপা।
ঝুপঝাপ – পতনের শব্দ।

ট

টগবগিয়ে – পানি ফুটবার মতো শব্দ করে, ধাবমান ঘোড়ার পায়ের শব্দ করে।
টাঙ্গা – এক ধরনের গাড়ি।

ঠ

ঠা-ঠা আলো – এত তেজি আলো যে চোখ মেলে তাকানো যায় না।
ঠেকায় – বাধা দেয়, মানা করে।

ত

তবলা – এক প্রকার বাদ্য যন্ত্র।
তাপ – উষ্ণতা।
তোরঙ্গ – টিনের তৈরি সুটকেস আকারের বাক্স। (সুটকেস চামড়ার তৈরি হয়।)

থ

থরথর – প্রচণ্ড কম্পন।

দ

দরদ – মমতা, টান।
দিগ্‌বিজয় – চারদিকের নানান জায়গা জয় করা।
দিদি – বড়ো বোন, আপা।
দিরহাম – আরবে প্রচলিত মুদ্রার নাম।
দুধের চাঁছি – দুধের শুষ্ক অংশ যা পাত্র থেকে চেছে তোলা হয়।
দুর্দশা – খারাপ অবস্থা।
দুর্লভ – যা সহজে লাভ করা যায় না বা পাওয়া যায় না।
দূত – বার্তাবাহক।
দুঃসাহসিক – অত্যন্ত সাহসের কাজ।

ধ

ধর্মচর্চা – ধর্ম বিষয়ে জ্ঞান লাভ ও অনুশীলন করা।
ধায় – ছোটা।
ধুঁকছে – হাঁপাচ্ছে।
ধূলিসাৎ – চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে মাটির সঙ্গে মিশে যাওয়া।

ন

নবান্ন – নতুন ধান কাটার পরে অগ্রহায়ণ মাসে অনুষ্ঠিত একটি উৎসব।
নবীন যাত্রী – যারা নতুন যুগের শিশু।
নারী জাগরণ – অধিকার সম্পর্কে মেয়েদের সচেতনতা।
নাশ – ধ্বংস, নষ্ট, ক্ষয়।
নিদর্শন – দৃষ্টান্ত।
নিলু – নিলাম।
নির্জলা – নির্ভেজাল, খাঁটি।
নিয়ন্ত্রণ – নিজের আয়ত্তে আনা।
নেবু – লেবু।

প

পথ-প্রান্তর – পথের পাশ, রাস্তার শেষ সীমা।
পরান – প্রাণ।
পশ্‌তু – বাংলা হিন্দি উর্দুর মতো পাঠান এলাকার একটি ভাষার নাম।
প্যাঁচ – মোচড়, মোড়ানো।
পরিবেশ – চারপাশের অবস্থা।
পরিশ্রম – খাটাখাটুনির কাজ।
পাট – আকাশের পশ্চিম দিকের শেষ ভাগে, অস্তাচল, যেখানে সূর্য ডোবে।
পাটা – তক্তা, ফলক।
পাঠশালা – বিদ্যালয়।
পাড় – কিনারা।
পালকি – মানুষ বাহিত যান বিশেষ।
পুষ্প – ফুল।
পৈঁজা – তুলা ধুনে বা টেনে আঁশ বের করা।
প্রেম – প্রণয়, ভালোবাসা।
প্রসাদ্‌ ভোজন – (গান শোনার জন্য) আশীর্বাদ বা দোয়া হিসেবে খাওয়া দাওয়া।
প্রতিষ্ঠা – তৈরি।
প্রজাতি – নানা ধরনের, নানা জাতের।
প্রাণকেন্দ্র – প্রধান জায়গা।
প্রসিদ্ধ – বিখ্যাত।
প্লাটফর্ম – রেলগাড়ি থামার স্থান, উন্নত সমতল ভূমি।

ফ

ফজলি আম – খুবই সুগন্ধ ও মিষ্টি স্বাদের আম।
ফলার – কলা ও অন্যান্য ফলমূল দিয়ে তৈরি করা খাবার।
ফারুক – সত্য ও মিথ্যার প্রভেদকারী।
ফৌজ – সৈনিক।

ব

বঙ্গদেশ – বাংলাদেশ, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগের অবিভক্ত অঞ্চল।
বঙ্গলিপি – বাংলা ভাষার বর্ণ বা হরফ।
বন্ধন – বাঁধন।
বন্দুকধারী – যার কাছে বন্দুক রয়েছে।
বন্দি – আটক।
বাক – কথা, শব্দ।
বর্ষাকাল – বৃষ্টির সময়।
বাঙ্কার – যুদ্ধের জন্য তৈরি করা মাটির গর্ত। যুদ্ধের সময় সৈনিকেরা এখানে আশ্রয় নিয়ে তাদের এলাকা পাহারা দেন ও যুদ্ধ করেন।
বাছ-বিচার – বাছাই করা বা ভালোমন্দ বিচার করা।
বায়তুলমাল – সরকারি কোষাগার।
বাহার – শোভা, সৌন্দর্য।
ব্যাকুল – আগ্রহী, ব্যস্ত, অস্থির।
বিচরণ – বেড়ানো বা ঘোরাফেরা করা।
বিশাল – অনেক বড়, প্রকাণ্ড, বিস্তীর্ণ।
বিহার – বৌদ্ধ মঠ।
বিচিত্র – নানা বর্ণ বিশিষ্ট, বিস্ময়কর।
বিজাতীয় – অন্য জাতির, ভিন্ন জাতির বা দেশের।
বিলিতি – বিলাত বা ইংল্যান্ডের কোনো কিছু।
বিধ্বস্ত হওয়া – ভেঙেচুরে যাওয়া। ধ্বংস হওয়া।
বিস্ফোরণ – চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ফেটে পড়া।
বিস্মিত – অবাক হওয়া, আশ্চর্য, হতবাক।
বীরশ্রেষ্ঠ – মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বের জন্য যারা সর্বশ্রেষ্ঠ।

বীরগাথা – বীরের গল্প।
বেদন – বেদনা, দুঃখ, কস্ট।
বেয়ারা (বেহারা) – যারা কাঁধে পালকি বহন করেন।
বৃথা – যাতে কাজ হয় না।
বৃষ্টিপাত – বাদলের ধারা।

ভ

ভক্ত – ভক্তি আছে এমন, ভক্তিমান (পিতৃভক্ত)।
ভক্তি – মান্য বা শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির প্রতি অনুরাগ, শ্রদ্ধা।
ভজন – দেব-দেবীর আরাধনা।
ভনভনিয়ে – ভনভন শব্দ করে।
ভাগিনা – বোনের ছেলে।
ভিক্ষু – বৌদ্ধদের মধ্যে যারা সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসী (যাঁরা সংসার করেন না); তাঁদের পরনে থাকে কাষাই (গেরুয়া) রঙের লম্বা কাপড়, মাথা থাকে মুড়ানো এবং চলা-ফেরা খাওয়া-দাওয়া সব কিছুতেই থাকে আলাদা বৈশিষ্ট্য।
ভুঁইচাপা – মাটির উপর জন্মানো ছোট চাঁপা ফুল।
ভোজন – আহার, খাওয়া।

ম

মসলিন – বিখ্যাত বস্ত্র, একসময় বাংলাদেশে তৈরি হতো।
ময়রা – যিনি মিষ্টি বানান।
মনীষী – শিক্ষিত জ্ঞানীগুণী বিখ্যাত মানুষ।
মহীয়সী – মহান যে নারী।
মন্ত্রণা – পরামর্শ।
মাংসাশী – যে মাংস আহার করে, মাংসই যার প্রধান খাদ্য।
মানত – কারো মনের ইচ্ছা পূরণ হলে সৃষ্টিকর্তাকে উদ্দেশ্য করে কিছু দেবার প্রতিজ্ঞা।
মাড়াসনে – পা দিয়ে পিষে না যাওয়ার নির্দেশ।
মিটাক – মিটিয়ে দিক, পূর্ণ করুক।
মুঠো – মুষ্ঠি।
মুষল – মুগুর
মুষলধারে বৃষ্টি – খুব বড়ো বড়ো ফোঁটায় যখন বৃষ্টি পড়ে।
মুক্তি – স্বাধীনতা, খোলামেলা অবস্থা।
মুক্তিবাহিনী – বাংলাদেশের মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য যারা যুদ্ধ করেছেন তাঁদের বাহিনী।
মুক্তিপাগল – এ দেশের মুক্তির জন্য যাঁরা সংগ্রাম করেছেন।
মুগ্ধ – আত্মহারা, বিভোর।
মেশিনগান – যুদ্ধে ব্যবহৃত বন্দুকের মতো অস্ত্র।
ম্যাপ – মানচিত্র।

য

যতবার যায় মরা – বাংলাদেশের স্বাধীনতার আগে এ দেশের মানুষকে মরণ–যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে। বারবার সহ্য করতে হয়েছে দুঃখ, কস্ট, অত্যাচার আর নিপীড়ন। তাই মৃত্যু যেন বারবার এসেছে।
যাতনা – কস্ট।
যোদ্ধা – যুদ্ধ করেন যিনি

র

রণক্ষেত্র – যুদ্ধের স্থান।
রথ – বিশেষ ধরনের গাড়ি।
রথী – রথ চড়ে যুদ্ধ করেন যিনি, বীরপুরুষ যোদ্ধা।
রক্ত–পিছল – রক্তে যা পিছল হয়েছে। (রক্ত যদিও পানির মতো তরল পদার্থ তবু পানির মতো নয়। রক্তের গন্ধ আছে, পরিষ্কার ভালো পানির কোনো গন্ধ নেই। রক্ত চটচটে আঠার মতো, কিন্তু পানি তেমন নয়। রক্ত আঠার মতো বলেই তা পিছল।)
রাঙা – রঙিন।

রাজত্ব – রাজার শাসন যেখানে চালু আছে।
রাবড়ি – খুবই মিষ্টি এক ধরনের খাবার।
রাম–খটাখট – খুব জোরেসোরে খটাখট শব্দ। (রাম শব্দে আমরা বড় আকারের কিছু বোঝাই। যেমন– রামছাগল, রাম বোকা, হাঁদারাম)
রাজ্য – রাষ্ট্র, যে দেশে পৃথক শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত আছে।
রূপান্তর – পরিবর্তন।
রূপান্তরিত – এক রকম থেকে অন্য রকম করে ফেলা।

ল

লবণাক্ত – লবণ মেশানো। নোন্তা স্বাদের।
লড়াই – যুদ্ধ, সংগ্রাম।
লাজুক – লজ্জা করে যে।
লেখালেখি – লেখা, রচনা।
লোকশিল্প – গ্রামের সাধারণ মানুষের তৈরি শিল্প।
লোকালয় – যেখানে লোকজনের বসবাস আছে।
লিপি - লিখবার কায়দা।

শ

শক্তি – ক্ষমতা, সামর্থ্য, বল (প্রাণশক্তি)।
শাসনকর্তা – প্রধান শাসক।
শিক্ষাসফর – শিক্ষা অর্জনের লক্ষ্যে যে সফর করা হয়।
শুধাবেন – জিজ্ঞাসা করবেন, জানতে চাইবেন।
শুষছে – তরল পদার্থ টেনে নেওয়া।
শোলক – শ্লোক, ছোট পদ, ছড়া।

স

সখ্য – বন্ধুতা, ভাব।
সংগ্রহ – আহরণ, একত্রীকরণ, সঞ্চয়।
সবরি কলা – এক রকম কলার নাম।
সমাজ – আমাদের চারপাশের পরিবেশ, মানুষ।
সতর্ক – সাবধান, হুঁশিয়ার।
সমতলভূমি – তল সমান যে ভূমির।
সরপুরিয়া – দুধের সর দিয়ে তৈরি এক রকম মিষ্টি।
সহস্র শহিদের – মুক্তিযুদ্ধে যাঁরা শহিদ হয়েছেন, সেইসব হাজার শহিদ।
সবুজ সোনালি ফিরোজা রূপালি – বাংলার প্রকৃতি বিচিত্র ও সুন্দর। প্রকৃতির নানা রঙে যেন সাজানো এ দেশ। সবুজ শস্যে ভরা আমাদের এ মাঠ। পাটের সোনালি আঁশ আমাদের সম্পদ।
স্মরণ – মনে করা।
সমৃদ্ধ – উন্নত।
সহ্য করা – সওয়া, মেনে নেওয়া।
সন্ধি – মিলন, কৌশল।
স্তব্ধ – নিস্পন্দ, নিশ্চল।
সমন্বয় – সামঞ্জস্য, মিলন।
সাঙ্গ – শেষ, সমাপ্ত।
সাধ – ইচ্ছা।
স্থাপত্য – স্থাপনা কেন্দ্রিক শিল্পকর্ম।
স্নানঘাট – গোসল করার জায়গা।
স্নানাভাবে – স্নানের অভাবে, গোসল না করতে পারায়।
সাক্ষর – অক্ষরজ্ঞান, বর্ণ চেনে এমন।
সালাত – নামাজ।
স্বাধীনতা – মুক্ত, নিজের ইচ্ছেমতো কিছু করতে পারা।
স্বীয় – নিজ, আপন।
সুপ্রাচীন – পুরাতন (পুরানো), বহুকাল আগের।
স্তূপ – ঢিবি, ঢিবির মতো বৌদ্ধদের সমাধি।

২০২৫

সুবক্তা	– ভালোবক্তা, যিনি গুছিয়ে বলতে পারেন।
সুধা	– অমৃত, মধু।
সূক্ষ্ম	– নিপুণ, সুন্দর।
সেনাপতি	– সেনাদলের প্রধান, প্রধান সৈনিক।
স্নেহ	– ভালোবাসা, প্রেম।
স্মৃতি	– মনে রাখা।
সোঁতা	– বহমান জলের মৃদু ধার।
সোহাগ	– আদর।
সোনার বাংলাদেশ	– প্রিয় মাতৃভূমি। বাংলাদেশকে আমরা ভালোবাসি। এ দেশকে নিয়ে আমরা গৌরব করি। এ দেশ প্রচুর সম্পদে ভরা। তাই এই বাংলাদেশকে বলে সোনার বাংলা।
সংমিশ্রণ	– একত্রীকরণ, মেশানো।

ষ

ষড়ঋতু	– ছয়টি ঋতু।

হ

হতাশ	– আশাহীন, নিরাশ।
হাটুরে	– জিনিসপত্র বেচাকেনার জন্য যে হাটে যায়।
হামলে পড়া	– হামলা মানে আক্রমণ। আর 'হামলে পড়া' বললে আক্রমণ করার মতো বোঝায়।
হিংস্র	– প্রাণ হারক, হিংসাযুক্ত প্রকৃতি বিশিষ্ট।
হেরিলে	– দেখিলে।
হোল্ডল	– যে বোঁচকার ভিতরে বালিশ বিছানা ভরে বেঁধে রাখা হয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় পতাকায় সবুজ ক্ষেত্রের উপর স্থাপিত রক্তবর্ণের একটি ভরাট বৃত্ত থাকবে।

পতাকা নির্মাণের নিয়মাবলি
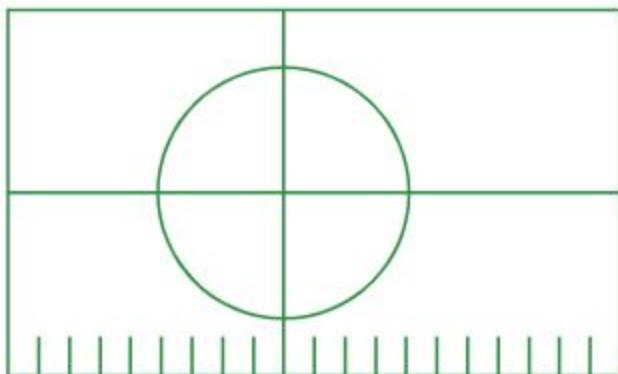
দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ১০ : ৬। অর্থাৎ যদি দৈর্ঘ্য ৩০৫ সেমি (১০ ফুট) হয়, প্রস্থ ১৮৩ সেমি (৬ ফুট) হবে। লাল বৃত্তটির ব্যাসার্ধ পতাকার দৈর্ঘ্যের পাঁচ ভাগের এক ভাগ। পতাকার দৈর্ঘ্যের ২০ ভাগের ৯ ভাগে একটি লম্ব (খাড়া সরলরেখা) টানতে হবে। তারপর প্রস্থের ঠিক অর্ধেক ভাগে দৈর্ঘ্যের সঙ্গে সমান্তরাল করে আর একটি রেখা টানতে হবে। এই দুটি রেখার ছেদবিন্দুই হবে বৃত্তটির কেন্দ্রবিন্দু।

ভবনে ব্যবহারের জন্য

(ভবনের আকার ও আয়তন অনুযায়ী)

৩০৫ সেমি x ১৮৩ সেমি (১০' x ৬')

১৫২ সেমি x ৯১ সেমি (৫' x ৩')

৭৬ সেমি x ৪৬ সেমি ($২\frac{১}{২}'$ x $১\frac{১}{২}'$)

জাতীয় সংগীত

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি ॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে–
ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি ॥

কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো–
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে–
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি ॥

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গাওয়ার জন্য জাতীয় সংগীতের পূর্ণপাঠ

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ,
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,
আমার প্রাণে
ও মা, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি,
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে–
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে কী দেখেছি
আমি কী দেখেছি মধুর হাসি।
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥
কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো–
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে–
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, আমি নয়ন
ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি ॥
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য, চতুর্থ শ্রেণি–বাংলা

হাত ধুই সুস্থ থাকি।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য